স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৭ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ৫ জানুয়ারি ২০১৫।। ২০ পৌষ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২০ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৫ জানুয়ারি - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : একটি অসুখের সন্ধানে ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

রাজ্য বিজেপি'র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্বও বৃদ্ধি পায় ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

ভারতের ইসলামিক সন্ত্রাসের শেকড় জড়িয়ে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার জালে ▯ একলব্য রায় ▯ ১১

কেন্দ্রকে অবহেলা করে রাজ্যের উন্নতি সম্ভব? ▯ ড. ভাস্কর পুরকায়স্থ ▯ ১৫

রাজ্যের অধিকারে আঘাত হানার অভিযোগ শুধু মমতা সরকারেরই ▯ ভাস্কর ভট্টাচার্য ▯ ১৭

আধুনিক বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার আদি ভূমি ভারতবর্ষ ▯ অর্ক ব্যানার্জি ▯ ২১

যে গানের আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ▯ চতুর্থ পাণ্ডব ▯ ২৩

দয়া করে শুনুন— কেননা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শ্রুতিগোচর ও চিরস্থায়ী ▯ এম জে আকবর ▯ ২৭

জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ▯ ২৯

জাতিদাঙ্গায় আবার অগ্নিগর্ভ অসম ▯ ৩১

ভিলাই স্টিল ক্লাব : পালাতে পারলে বাঁচি! ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রকাশিত হবে
১২ জানুয়ারি
২০১৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১২ জানুয়ারি
২০১৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীতে নীতি শিক্ষা

ইদানীং খবরের কাগজের পাতা খুললেই নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নীতিহীনতার যে সংবাদ দেখি, তা যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকেরই মনোবেদনার কারণ। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে নীতি ও অতীত গৌরবের বিষয়ে শিক্ষার অভাবই এর মূল কারণ। এই প্রসঙ্গ নিয়েই এবারে আলোচনা করেছেন **প্রবীর ঘোষ, ড. সর্বাণী চক্রবর্তী ও সমর কুমার বোস।**

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

পর্বতের মূষিক প্রসব

একুশ বছর পূর্বে ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই যুবকংগ্রেসের মহাকরণ অভিযান ঠেকাইতে পুলিশ গুলি চালাইলে কলকাতার রাজপথে ১৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন যুব কংগ্রেসের তৎকালীন রাজ্য সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা লইয়া অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিশন তাহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। এত ঘটা করিয়া কমিশন গঠন এবং তাহার কর্মধারা চলিলেও কমিশন অশ্বডিম্ব প্রসব করিয়াছে, কারণ এত কিছুর পরেও মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই। সেইদিনের গুলি চালাইবার পিছনে আসল ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কমিশন ব্যর্থ হইয়াছে। তৎকালীন পুলিশমন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়াছে কমিশন। এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তের তালিকায় সেদিন যাঁহার নাম বেশি আলোচিত হইয়াছিল, সেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব ও বর্তমানে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত প্রসঙ্গেও কমিশন স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। অন্যান্য পুলিশ অফিসার প্রসঙ্গেও কমিশন নীরব। এখন প্রশ্ন, কমিশনের এই ব্যর্থতা কি ইচ্ছাকৃত? উত্তর হইতেছে বিগত সরকারের আমলে যে পুলিশ অফিসাররা অপরাধমূলক কার্য করিয়াছিল এই সরকার কোনো এক অদৃশ্য কারণে তাঁহাদের সকলকেই পুরস্কৃত করিয়াছে। ভিখারী পাশোয়ান মামলায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে এই সরকারই পুরস্কৃত করিয়াছে। নন্দীগ্রামের ঘটনায় কলঙ্কিত পুলিশ অফিসারদেরও পুরস্কৃত করা হইয়াছে। বস্তুত সেদিনের অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারেরাই আজকের মুখ্যমন্ত্রীর গুণমুগ্ধ স্তাবক। যে পুলিশবাহিনী সেদিন বামফ্রন্টের দালালি করিয়া বিরোধীদের অত্যাচার নির্যাতন করিত, তাহারাই আজ তৃণমূলের দালালি করিয়া বিরোধীদের নির্যাতন করিতেছে। দিন পালটাইয়াছে মাত্র, কিন্তু পুলিশের মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

কমিশন পুলিশের গুলি চালাইবার ঘটনাকে অনৈতিক, বেআইনি, অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক বলিলেও কাহাকেও দোষী সব্যস্ত করিতে পারে নাই। বিনা প্ররোচনায় গুলিচালানো হইয়াছিল; স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশের শীর্ষ-কর্তারা সেইদিন তাঁহাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁহার দপ্তর, স্বরাষ্ট্রসচিব, লালবাজারের কর্তারা গুলিচালানোর দায় এড়াইতে পারেন না—এত কথা বলিলেও কাহার নির্দেশে সেইদিন গুলি চালানো হইয়াছিল তাহার উত্তর কমিশন দিতে পারে নাই। পুলিশ কী করিয়া গুলি চালাইল, ইতিহাস তাহার বিচার করিবে বলিয়া কমিশন তাহার দায় ও দায়িত্ব এড়াইয়াছে। বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য এই জন্যই বলিয়াছেন, 'যে সরকারে মণীশ গুপ্ত বরণীয়, সেইখানে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। শহিদদের আত্মা এবং তাঁহাদের পরিবার ইহাতে প্রতারিত হইল'। কমিশনের সুপারিশ মতো নিহতদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হয়তো দায় এড়াইবেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন পুলিশের নিরপেক্ষতা, তাহা পরিবর্তনের জামানায়ও অদৃশ্য রহিল। পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার পরিণতিতেই যে ২১ জুলাই এতগুলি যুবকের প্রাণ বলি হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার আজও চলিতেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বামফ্রন্টের প্রদর্শিত পথেই পুলিশকে ব্যবহার করিতেছে। তাহা হইলে কমিশন পুলিশকে দোষী সব্যস্ত করিবে কোন সাহসে? কমিশন সুপারিশ করিয়াছে, গণতান্ত্রিক কোনো রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, মিছিলে যাহাতে পুলিশ কোনোভাবেই মৃত্যু ঘটাইবার মতো অস্ত্র ব্যবহার না করে, তাহা নিশ্চিত করিতে পুলিশ রেগুলেশন সংশোধন করা হউক। কমিশনের এই সুপারিশ মানিবার মতো সদিচ্ছা ও মনোভাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাই, কারণ আগামীদিনে তিনিও ২১ জুলাই ইহার মতো পুলিশকে দিয়া রাজনৈতিক দলের প্রতি গুলি চালাইবেন না তাহা নিশ্চিত নয় এবং সেই ক্ষেত্রেও ঘটনার প্রশাসনিক ও তদন্ত রিপোর্ট নিশ্চিত ভাবেই মহাকরণ ও লালবাজার হইতে রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়া যাইবে। বস্তুত কমিশনের এই রিপোর্ট পর্বতের মূষিক প্রসব মাত্র।

সুভাষিত

পদাহতং যদুত্থায় মূর্ধানমধিরোহতি।
স্বস্থাদেবাসমানেঽপি দেহিনস্তদ্‌বরংরজঃ।

পদাঘাতে জর্জরিত ধূলা মাথায় চড়ে যায়। অপমানিত হওয়ার পর যে চুপচাপ থাকে তার থেকে ধূলাও উৎকৃষ্ট।

সারদা-জামাতের যোগসূত্রের খোঁজে এন আই এ-সিবিআইয়ের যৌথ তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারদা কেলেঙ্কারি কাণ্ডে এবার সিবিআইয়ের সঙ্গে এন আই এ যৌথ তদন্তে এই পঞ্জি স্কিমের মাধ্যমে অর্থ-তছরূপ-সহ বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ড ও বাংলাদেশের জামাত উল মুজাহিদিনের যোগসূত্রের সন্ধানেও নামল। সূত্রের খবর গত ১৮ ডিসেম্বর এই দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকেরা রাজধানীতে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন পারস্পরিক সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদানের ভিত্তিতে উভয় তদন্ত চালানো হবে। কলকাতায় বিজেপি-র এক অনুষ্ঠানে এসে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ অভিযোগ করেছিলেন সারদার টাকা খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বাংলাদেশে জামাতের হাতে তা গিয়েছিল। এরপর লোকসভায় এক লিখিত বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, সারদা-কেলেঙ্কারির সঙ্গে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের যোগাযোগের কোনো প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই। এই প্রেক্ষিতে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকের ফলে অমিত শাহের বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণিত হলো বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। এন আই এ আধিকারিকেরা এখন খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশের যোগ খুঁজতে ব্যস্ত ছিলেন। তখন সিবিআই সারদার টাকা অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশে কাদের কাছে, কী উদ্দেশ্যে গিয়েছে তার তদন্ত করছিল। তদন্তে দেখা যায় এদেশের বিপুল অঙ্কের টাকা বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে। এই টাকা কোন্ খাতে ব্যয় হচ্ছে তার প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দাদের অনুমান— খাগড়াগড় বিস্ফোরণ-সহ অন্য নাশকতার ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। সারদা ও বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে গোয়েন্দারা পারস্পরিক যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন বলেই উভয় সংস্থার পক্ষেই তথ্য আদান-প্রদান জরুরি হয়ে উঠেছে বলে বিশেষ সূত্রের খবর। সূত্র আরও বলছে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু রাজনৈতিক কারবারি ও বাংলাদেশের জামাতের মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা হাতবদলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই টাকা বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, মূলত ইসলামি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হয়েছে এবং কিছু এনজিও-র মাধ্যমে এই বিপুল অর্থের কিছু অংশ পুনরায় কলকাতায় ফিরে এসেছে। সূত্র বলছে, খাগড়াগড় বিস্ফোরণে নিহত শাকিল আহমেদ গত তিন বছরে অন্তত আঠেরো বার বাংলাদেশে টাকা নিয়ে গিয়ে সেদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা জমা করে। অসম থেকে গ্রেপ্তার হওয়া জামাতের 'শল্যচিকিৎসক' শাহনূর আলম এবং মায়ানমারে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম দেখাশুনো করা আব্দুল খালেদকে জেরা করে এন আই এ গোয়েন্দাদের অনুমান বাংলাদেশে পৌঁছোনো অর্থের পরিমাণ আরো বেশি। হাওলা পথ দিয়ে বাংলাদেশ ছাড়াও কুয়েত ও সৌদি আরবেও সারদার টাকা গিয়েছে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মকে প্রশ্রয় দিতে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। এতে এ রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক কারবারির মদত রয়েছে বলেই সিবিআই সাহায্য তাঁদের দরকার বলে এন আই এ আধিকারিকেরা মনে করছেন। এন আই এ ইতিমধ্যেই রাজ্যসভার এক তৃণমূল সাংসদ এবং প্রাক্তন তৃণমূল নেতার ব্যাঙ্ক আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখছে, যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে। এন আই এ সূত্রে খবর, শুধু সারদা ও বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের যোগসূত্রের প্রমাণই নয়, সীমান্ত পেরিয়ে যে কোটি কোটি ভারতীয় অর্থ বাংলাদেশে গিয়েছে সে প্রমাণও তাদের হাতে রয়েছে।

শাহনুর আলম

নজরবন্দি

১. জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন রাজনৈতিক কারবারির মধ্যে হাতবদল ৭৫ কোটি টাকা।

২. বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে প্রথমে সেই অর্থ রাখা হয়েছিল এবং কয়েকটি এন জি ও-র মাধ্যমে তা ফের এরাজ্যে চলে আসে। প্রশ্ন কেন? সন্ত্রাসের কাজে?

৩. খাগড়াগড় বিস্ফোরণে নিহত শাকিল আহমেদ গত তিন বছরে অন্তত ১৮ বার বাংলাদেশে টাকা সরান।

৪. তৃণমূলের এক রাজ্যসভার সাংসদ ও এক প্রাক্তন নেতার ব্যাঙ্ক ট্রানজাকশন খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা যাদের বিরুদ্ধে সারদা-র টাকা বাংলাদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেবার অভিযোগ।

ক্রিকেট থেকে কয়লা—সুপ্রিম কোর্ট ধুয়েই চলেছে ঘোটালার ময়লা

সব রকমের বড় সরকারি কাজকর্মের ওপরই নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৪ সাল ব্যাপী কয়লা থেকে শুরু করে নানান কেলেঙ্কারী পর্ব হয়ে মায় তথাকথিত ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেট কেলেঙ্কারী ফাঁস করার ধাক্কা বিগত মনমোহন নেতৃত্বাধীন সরকার সামলাতে পারেনি। পরিণতিতে দিল্লীর তখতে বিপুল জয় নিয়ে আসীন হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। সন্দেহ নেই এই অজস্র কেলেঙ্কারির অভিঘাত মোদীর নির্বাচনী জয়কে সাহায্য করেছিল।

দেশে আইনের শাসনকে মর্যাদা দিতে সর্বোচ্চ আদালত এক ধাক্কায় অতীতের সরকারগুলির কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে সুদূর ১৯৯৩ সাল থেকেই অসম কয়লাখনি বন্টনের প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। বাতিল হয়ে যায় বহু দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ থাকা উত্তোলনের অধিকার। বাতিল খনির সংখ্যা ২১৪।

ঠিক কয়লার মতোই দেশের সর্বোচ্চ ক্রিকেট তদারকি সংস্থা বিসিসিআই-এর ক্রিয়াকলাপও আদালতের নজরে আসে। পরিণতিতে ন্যায়াধীশ মুকুল মুদগল কমিটি বোর্ড সভাপতি এন. শ্রীনিবাসন-এর জামাই গুরুনাথ মায়াপ্পনকে টাকার খনি আই পি এল টি-২০ ম্যাচের ক্ষেত্রে ফিক্সিং এর কলকাটি নাড়ার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। এই মর্মে বিচারপতিদের প্যানেলটি জানিয়েছে, মায়াপ্পন নিজে আই পি এল-এ অংশগ্রহণকারী তাঁর শ্বশুরের ইন্ডিয়া সিমেন্ট কোং-এর টাকায় চলা চেন্নাই সুপার কিংস-এর ও এক কর্তা।

গোটা ২০১৪ সাল ব্যাপীই সবরকমের সরকারি সিদ্ধান্তের ওপরই সর্বোচ্চ আদালত তার নজরদারি জারি রেখেছিল এমনটা অবশ্যই বলা যায়। সূত্র অনুযায়ী সবরকমের প্রাকৃতিক সম্পদ বন্টন, বিদেশ থেকে কালো টাকা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি, সিবিআই অধিকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া, দুর্নীতিবিরোধী নিরীক্ষক সিভিসি-র নিয়োগ থেকে জুয়ায় ডুবে থাকা ক্রিকেট কর্তাদের জনমানসে বেপরদা করে দেওয়া— কিছুই বাদ যায়নি।

এই সূত্রে বিদেশ থেকে কালো টাকা দেশে ফেরানোর ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কি কি পন্থা অবলম্বন করেছে আদালত তার ফিরিস্তি চায়। সরকারের পক্ষে কালো টাকা ফেরাতে এস আই টি গঠনের উল্লেখে অসন্তুষ্ট আদালত পত্রপাঠ সরকারকে অধিক সংখ্যায় বিদেশের ব্যাঙ্কে কালোটাকা মজুতকরা দাগিদের নাম ঘোষণায় বাধ্য করে।

উল্লেখ্য দেশের সর্ববৃহৎ অথচ শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত নয় এমন অর্থসঞ্চয়ী সংস্থা সাহারা কর্ণধার সুব্রত রায় সময়মতো আমানতকারীদের অর্থ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগে কারাবাস করছেন। দেশের নাগরিকদের সঞ্চয় সুরক্ষিত করতে সাহারা কর্তৃপক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা জমা দিলে তবেই সংস্থা অধিকর্তার জামিন মঞ্জুরির কথা ভাবা হবে এমনটাই জানিয়েছে মহামান্য আদালত। আদালতেরই আদেশে সাহারা কর্তা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে জেল হেফাজতে দিন কাটাচ্ছেন।

ওদিকে বেটিং কেলেঙ্কারিতে সরাসরি জড়ানোর অভিযোগ থেকে বর্তমানে অব্যাহতি পেলেও সাময়িকভাবে বরখাস্ত বি সি সি আই প্রধানের একইসঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংস দলের মালিক থাকার বিষয়টি আদালত গভীর সন্দেহের চোখে দেখছে। তাই কি সাহারা বিসিসিআই এই দুই অধিকর্তাই ব্যাকুলভাবে নজর রাখছেন নতুন বছরের দিকে যদি কোনো সুরাহা তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে! তবে সর্বোচ্চ আদালত সব থেকে নির্মম রায় দিয়েছিল পূর্বতন সিবিআই অধিকর্তা রণজিৎ সিনহার ক্ষেত্রে। আদালত তাঁকে সরাসরি ২-জি ও কয়লা ঘোটালার তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়াতে বলে। কেননা সিনহার বিরুদ্ধে কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের আড়াল করার অভিযোগকে বিচারপতিরা যথার্থ বলেই বিবেচনায় এনেছিলেন। অবসরের আগে সিনহাকে তদন্তগুলি থেকে হাত গোটানোর আদেশ দেওয়া একটি নজিরবিহীন নির্দেশ।

অবশ্যই পূর্বে সিবিআই-কে শাসক দলের পোষা তোতা অভিধায় অভিহিত করলেও পরবর্তীকালে দেশের এই সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থাকে সরকারি প্রভাবমুক্ত করতে আদালত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আদেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে উচ্চপদস্থ আমলাদের ক্ষেত্রে তদন্ত- প্রক্রিয়া শুরু করতে আগের মতো প্রথমেই সরকারের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আদালতের তত্ত্বাবধানে থাকা যে কোনো মামলাতেই সংস্থা সরাসরি আমলাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নির্দ্বিধায় নিতে পারবে। দেশের আইনি ইতিহাসে এটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। তাই মনে হয় এলাহি ভরসা নয়, আদালতই হয়তো শেষ ভরসা।

তেরো বছরে প্রায় পাঁচ গুণ বেড়েছে সন্ত্রাসবাদী হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কি ব্যর্থ হচ্ছে? সম্প্রতি প্রাপ্ত এক তথ্যে এই প্রশ্ন উঠে এসেছে। ২০০০ সালের তুলনায় ২০১৩-তে সন্ত্রাসবাদী হামলার সংখ্যা ৫ গুণ বেড়েছে। ২০১৩-তে এই হামলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০০০, এমনটাই জানা গেছে ইউ এস ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল টেরোরিজম ডেটাবেস (জিটিডি)-এর রিপোর্ট থেকে। এছাড়া আরো জানা গেছে, সন্ত্রাসবাদী হামলা ইতিমধ্যে বিশ্বের মোট ৮৭টি দেশে ঘটেছে যার মধ্যে ৬৭টি দেশে প্রাণহানি পর্যন্ত হয়েছে। তবে আশার আলো এটুকুই যে সন্ত্রাসবাদী হামলার ৬০ শতাংশই মূলত পাঁচটি দেশেই সীমাবদ্ধ— ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং সিরিয়া। তবে এই দেশগুলির মধ্যে ইরাক এবং আফগানিস্তান এক দশকের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের আখড়া হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনা স্কুলে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৩৪ জনের শিশুর মৃত্যুই তা প্রমাণ করে দেয়। আবার সিরিয়ার গৃহযুদ্ধও ক্রমশ সন্ত্রাসবাদের আভাস দেয়। ২০১৩-তে এই পাঁচটি দেশে ৪০০০ এর উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। ২০০১-এ ৯/১১ ঘটনা ঘটার পর ইউ এস সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ক্রমশ বাড়ছে

সাল	সন্ত্রাসবাদী হামলা সংখ্যা	
২০০০	১,৭৭৭	
২০০১	১,৮৭৮	৯/১১-তে ইউ এস আফগানিস্তানে সশস্ত্র আক্রমণ করে।
২০০২	১,২৯৮	
২০০৩	১,২৫৩	ইউএস ইরাকে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।
২০০৪	১,১৫৪	
২০০৫	২,০১০	
২০০৬	২,৭২৮	ইরাকে আঞ্চলিক সন্ত্রাস
২০০৭	৩,২৩৫	
২০০৮	৪,৭৮০	
২০০৯	৪,৭১৫	
২০১০	৪,৭৮২	
২০১১	৫,০০৭	সিরিয়তে যুদ্ধ শুরু
২০১২	৮,৪৮০	
২০১৩	১১,৯৫২	

২০০০-২০১৩ সালে মোট হামলার সংখ্যা ৫৫,০৪৯

সূত্র : জিটিডি, ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়; ইন্সটিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস।

ভারত-বিরোধী প্রচার চলছে ভারত-চীন সীমান্তে চীন-চর্চাকেন্দ্র ও মঠ তৈরি করে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের অনেকটা অঞ্চল জুড়ে চীন সীমান্ত। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। চীন তার ক্ষমতার দম্ভে ভারতভূমিতে বিভিন্নভাবে ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্ত বরাবর এমনসব কাণ্ডকারখানা মতলব এঁটে বিস্তার করছে যার দরুন ভারতের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। সম্প্রতি আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরেছে নেপাল আর ভুটান লাগোয়া ভারতের সীমান্তে চীন প্রায় পঞ্চাশটি চীন-চর্চা কেন্দ্র আর মঠ স্থাপন করেছে। যেগুলি আপাত নিরীহ সংস্কৃতিকেন্দ্র মনে হলেও আসলে তা নয়। সেগুলির মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে নানাভাবে মতলব আঁটা চলেছে। জম্মু-কাশ্মীরে সীমান্ত এলাকায় প্রায়ই চীনা সৈন্যরা ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়ে— এজন্যে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সীমা বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশের সশস্ত্র সেবা বল (এস এস বি) একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে জানিয়েছে নেপালে চীনের তৈরি ২২টি চীন-চর্চা কেন্দ্র স্থাপন হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি ৪,১.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-নেপাল সীমান্ত লাগোয়া। ওইসব অধ্যয়ন কেন্দ্র কোন্ কোন্ কাজ করছে? তথ্য মিলেছে, ওই কেন্দ্রগুলি চীনের সংস্কৃতি, পরম্পরা, পঠন-পাঠন, অর্থব্যবস্থার কথা নেপালের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করছে। আশঙ্কা হচ্ছে নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে চীনের ওইরকম প্রচারকর্ম ভারতভূমিতেও ঢুকে পড়বে। নেপাল ও ভুটান লাগোয়া ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত বলেই দুর্ভাবনা বেশি। ওখানে কোনো দেশের নাগরিকদের আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরকম বিধিনিষেধ নেই। ভারতের সঙ্গে নেপালের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্বন্ধ দৃঢ় রাখতে আগ্রহী নেপাল। সেখানে লুকোছাপা করে চীনারা ঢুকে পড়ছে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকর্ম জোরদার করার জন্যে চীনের ওই কেন্দ্রগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের চীনা ভাষা শেখানো হচ্ছে, সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত করানো হচ্ছে, এছাড়া চীন-কথার নানাভাবে প্রচার চলেছে। ওইসব চীন-চর্চাকেন্দ্র ছাড়াও ভুটান সিকিমে ও ভারত সীমান্তে ২২টি বৌদ্ধ মঠ তৈরি হয়েছে— এখবর মিলেছে। সরকারি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে— ওইসব বৌদ্ধ মঠের অস্তিত্ব গত চার পাঁচ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। আর যেভাবে সেগুলি বেড়ে চলেছে তাতে কিছু সন্দেহ জাগছে। যেখানে মঠগুলো তৈরি হয়েছে সেখানে একজনও বৌদ্ধ নেই। তাই প্রশ্ন উঠছে কেন এই বৌদ্ধমঠ তৈরির তৎপরতা? ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্য, না ভারত-বিরোধী ঘাঁটি তৈরি?

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ বিশ্বেশ্বর রতন দাস ও সোনারপুর নগর ব্যবস্থা প্রমুখ শৈলেশ্বর রতন দাস-এর মাতৃদেবী পারুলরানী দাস গত ১৮ ডিসেম্বর (২০১৪) পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিদের তিনি রেখে গেছেন।

একটি অসুখের সন্ধানে

মাননীয় মদন মিত্র
ক্রীড়া ও পরিবহণমন্ত্রী
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা

দাদা,

আপনি ভালো আছেন তো! আমি জানি আপনার বেজায় অসুখ। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তাররা কিছুই করতে পারল না। সবার সার্টিফিকেট ফেক কিনা চেক করা দরকার। আর দরকার পিজি হাসপাতালের কাছ থেকে রাজ্যের সর্বোত্তম তকমাটা কেড়ে নেওয়া। সব সরকারি টাকায় গাদা গাদা মাইনে পায় কিন্তু সরকারি হাসপাতালে থেকে সরকারি মন্ত্রীর একটা সরকারি অসুখ বার করতে পারে না।

আমার মনে পড়ছে সুকুমার রায়ের রাজার অসুখ গল্পটা। আপনার সিলেবাসে ছিল কিনা জানি না। তাই গল্পের গোড়ারটুকু টুকে দিচ্ছি।

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব দলে দলে আসে আর যায়। অসুখটা যে কী কেউ বলতে পারে না। অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কী করে? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজামশাই কেবলই বলেন 'ভারি অসুখ', কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না! কত রকমের কত ওষুধ রাজামশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হলো না। মাথায় বরফ দেওয়া হলো, পেটে সেঁকে দেওয়া হলো, কিন্তু অসুখের কোনো কিনারাই হলো না।

তখন রাজামশাই গেলেন ক্ষেপে। তিনি বললেন— "দূর করে দাও এই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সব কিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।"

তা তাড়াবেন না করবেন কি! রাজার পয়সায় খেয়ে রাজার অসুখ যাঁরা খুঁজে পায় না তাঁদের অমন শাস্তি পাওয়াই উচিত। এক্ষেত্রেও তাই। আপনি ক্রীড়ামন্ত্রী বলে কি আপনি সত্যি সত্যিই পুরোপুরি ফিট! আরে বাবা একটা নতুন রোগের নামও তো বলা যেতে পারে নাকি! তাছাড়া সরকারি হাসপাতালের ওই সব সেকেলে যন্ত্রপাতিতে রোগ পরীক্ষা করে কি সব সময় ঠিক ঠাক উত্তর পাওয়া যায় নাকি! দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় রক্তের নমুনা, কাটা চুল, নখ, মল-মূত্র ইত্যাদি পাঠালেও তো হোত। একটু দূরে দূরে পাঠালে রিপোর্ট আসতেও সময় লাগত। তারপর না হয়, একটা বিদেশি রোগের নাম বলে এদেশে চিকিৎসা হয় না জানিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। বাঙালি তো হাঁপানি, আমাশা, বাত নিয়ে পড়ে আছে। আজকাল বিদেশে তো কত কত নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার হয়েছে। কী সুন্দর সুন্দর সব শক্ত শক্ত খট-মট নাম। শুনলেই সিবিআই আর আদালতের বিচারপতিদের চোখ গোল গোল হয়ে যেত। কাছাকাছি আসতে পারত না। একটা ছোঁয়াচে রোগের নাম বললে সব থেকে ভালো হোত। কেউ ছুঁতেই পারত না।

এর থেকে দাদা বেসরকারি হাসপাতাল ভালো। সেখানে তবু প্রথম দফায় যখনও সিবিআই ডাকেনি তখন শিরদাঁড়ায় একটা ফোঁড়া আবিষ্কার হয়েছিল। তারপর সেটা কোথায় উবে গেল কে জানে? কত গরিব মানুষের কত রোগ হয়। সারাবার পয়সা নেই তাদের। ওপরওয়ালা তাদের বেশি বেশি রোগ না দিয়ে তো আপনার মতো যাদের সত্যিকারের অসুখ দরকার তাদের দিতে পারেন। এসবই দাদা, কেন্দ্রের চক্রান্ত। মা-মাটি-মানুষ সরকারকে বিপদে ফেলার কারসাজি।

আমার ভাইপোটার নামও মদন। ঠিক আপনার মতোই হয়েছে। পরীক্ষার সময় হলেই ওর পেটে ব্যাথা, দাঁত কন-কন সহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

যাইহোক, দিদির নির্দেশে কিংবা সরকারি হাসপাতালের ওপর ভরসায় কিংবা রোগ আবিষ্কার নিয়ে বেসরকারির ওপর আস্থা হারিয়ে আপনি দুম করে পিজিতে সেঁধিয়ে গেলেন। তখন আবার সবাই বলাবলি করল, আপনি নাকি ওখানে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু এই পোড়া দেশটা বুঝল না, আসলে আপনি নতুন রোগ আবিষ্কারের জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড বা টিম গঠনের জন্য পিজিতে গিয়েছিলেন। আর আপনি ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে টিম গেমে বিশ্বাস করেন। তবে শেষ পর্যন্ত খেলা গোল লেস ড্র হয়ে গেল। আপনাকে ক'দিন বাড়িতে রেস্ট নিয়ে যেতেই হলো সিবিআইয়ের সঙ্গে কবাডি খেলতে। প্রথমেই ওরা এমন জাপ্টে ধরল যে নিজের কোর্টে ফিরতে পারলেন না। তারপর আপনার দিদি মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফাউল ফাউল বলে অনেক চেল্লালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সব শেষে জেলে গিয়ে নতুন অসুখের ভালো ড্রামা নামিয়েছিলেন। কিন্তু পিজির ডাক্তার টিম নতুন আবিষ্কারের সুযোগটা নিতেই পারল না।

ওরা আপনাকে বারবার জিজ্ঞেস করল আপনার অসুখটা কি? কিন্তু পাস করে ডাক্তারি ডিগ্রিটা কারা পেয়েছে? ওরা না আপনি? ওদেরই তো বলা উচিত রোগটা কী। যত্ত সব আহাম্মক।

যাই হোক মন্ত্রিমশাই দাদা, আমি জানি আপনি একদিন নিজেই নিজের রোগ আবিষ্কার করে নিজেই সেরে উঠবেন। রাজার অসুখ গল্পের রাজার মতো বলবেন—

"যা হতভাগা মুখ্যুগুলো সব,
সভায় বসগে যা! তোরা কেউ
কিছু করতে পারলি না, এখন এই
দেখ আমার অসুখ আমি নিজেই
সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে
আবার সভায় গিয়ে বসব।
আর যে টু শব্দটি করবে
তার মাথা উড়িয়ে দেব!"

—সুন্দর মৌলিক

রাজ্য বিজেপি-র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্বও বৃদ্ধি পায়

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গের দলীয় পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং। বিজেপি-র সদস্য সংগ্রহ অভিযানের আগে পর্যন্ত এই রাজ্যে বিজেপি-র সদস্য ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার। সিদ্ধার্থনাথ সিং আশা করেন আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সদস্য সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। বিজেপি-র সদস্য সংগ্রহ অভিযান মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে রাজ্যে বিজেপি-র রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বাড়ছে। বিজেপি-র শ্রীবৃদ্ধিতে তৃণমূলের দিদিমণি এখন দিশাহারা। বাম দল এবং কংগ্রেস জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। নিঃসন্দেহে এই রাজ্যে জনসমর্থনের হাওয়া বিজেপি-র পালেই লেগেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এর অন্য দিকও আছে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের দায়িত্বও বৃদ্ধি পায়। আলটপকা অগোছালো মন্তব্য দলের স্বচ্ছ, ভদ্র, জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবেদক মনে করে যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভের মূল কারণটি অনুসন্ধান না করে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব আলটপকা মন্তব্য করে ঠিক করেননি। বিশ্বের প্রায় সমস্ত উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার অধিকার ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি বা পদে অবনমন হয়। ভারতে এই ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। একবিংশ শতকে হওয়া উচিত ছিল। মনে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীদের চাকরি ও মাস মাইনে দেওয়ার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছে যথার্থ উচ্চশিক্ষা পাবেন সেটাই সকলে আশা করেন। সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশাসন পরিচালনা করেন সম্পূর্ণ

গূঢ়পুরুষের কলম

নিরপেক্ষভাবে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য যে বাম রাজত্বে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিলায়নের পর থেকে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা শাসকদলের প্রতিনিধি হিসেবে পদে যোগ দেন। যোগ্যতার বদলে রাজনৈতিক যোগাযোগই এখন উপাচার্যদের প্রধান শক্তি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীকে ছাত্রছাত্রীরা চাইছেন না। তাঁকে সরানোর দাবিতে সেখানে দীর্ঘ আন্দোলন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়দের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ মনে করছেন অভিজিৎবাবু উপাচার্য পদের যোগ্য ব্যক্তি নন। একথা অজানা নয় যে অভিজিৎবাবু খোদ তৃণমূল নেত্রীর সুপারিশে যাদবপুরের উপাচার্য হয়েছেন। তাই তিনি বুক বাজিয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ছাত্রছাত্রীরা আমাকে না চাইলেও পাবলিক এখনও আমাকে চায়।' অর্থাৎ উপাচার্য পাবলিকের প্রতিনিধি। ছাত্রছাত্রীদের নন। অভিজিৎবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। উপাচার্যপদের রাজনীতিকরণ হলে এমন কথাই বলাটা স্বাভাবিক।

কেন যাদবপুরের আন্দোলন চলছে সে বিষয়ে মন্তব্য না করেও একটা কথা বলা যায় যে ছাত্রছাত্রীদের কথা শোনা উচিত। তাঁদের মতামতকে উপেক্ষা করে সব দোষ ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। আন্দোলনে উস্কানি দিচ্ছে নকশালবাদীরা মেনে নিলেও স্টুডেন্টদের কথা আচার্য তথা রাজ্যপালকে শুনতে হবে। এটাই শিষ্টাচার। ছাত্রছাত্রীরা আচার্য এবং উপাচার্যের সন্তানতুল্য। অবিভাবক। সন্তান ভুল করলে তা শুধরে দেওয়াটা অবিভাবকের প্রধান কর্তব্য। গেট আউট বা গো-ব্যাক বলে সন্তানের ভুলভ্রান্তি শোধরানো যায় না। বয়স যখন কম থাকে তখন মানুষ যতটা অধৈর্য হয় প্রবীণ বয়সে ততটা নয়। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানুষকে ধৈর্যবান করে। দায়িত্বশীল করে। আচার্য-রাজ্যপাল নিজেই বলেছেন, 'কেউ শংসাপত্র নিতে পারে, নাও নিতে পারে, সেটা তার ব্যাপার। ওই ছাত্রী কোনো দুর্ব্যবহার করেনি। অত্যন্ত বিনম্র ভাবে সে শংসাপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে।' যাদবপুরের কলা বিভাগের সেরা ছাত্রী মালদার গীতশ্রী সরকার তাঁর স্বর্ণপদক এবং শংসাপত্র উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে নিতে চাননি। যাদবপুরের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করে শাসকদলের মনোনীত উপাচার্যের অপসারণ চেয়েছিলেন তিনি। তাঁকে ভিলেন বানিয়ে মন্তব্য করা যে যারা লেখাপড়া করে না তারাই যাদবপুরে আন্দোলন করছে মেনে নেওয়া যায় না। এই রাজ্যে বিজেপি-র জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সদস্য সংখ্যা ২০ লক্ষে পৌঁছতে পারে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কলেজ নির্বাচনে সাড়া জাগানো সাফল্য পাচ্ছে। ঠিক তখনই টেলিভিশনে বাইট দিতে গিয়ে আলটপকা মন্তব্য করাটা ঠিক নয়। রাজ্যের তরুণ ও যুবকদের কথা শুনতে হবে। হ্যাঁ, পছন্দ না হলেও শুনতে হবে। বুঝতে হবে। তৃণমূল নেত্রী বিরোধী কণ্ঠস্বর শোনেন না। কণ্ঠরোধে বিশ্বাসী। আশা করি বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব সেই পথে হাঁটবেন না। ভাবনা চিন্তা করে চলার সময় এখন। বিজেপি-র হাতে এই রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা আসাটা শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কথাটা ভুললে চলবে না।

ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসের শেকড় জড়িয়ে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার জালে

একলব্য রায়

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। অন্যের মতকে, ভাবনাকে, আচরণকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা ও সহ্য করার পোশাকী নাম গণতন্ত্র। আভিধানিক অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ যাই হোক না কেন ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির

দিগ্বিজয় সিং

বিনায়ক সেন

সিদ্দিকুল্লাহ

ঘোষিত অর্থ সব ধর্মে সমভাব, সমশ্রদ্ধা, সমমর্যাদা দান। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিন্দুদের জীবন দর্শন হিন্দুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই শাসন ব্যবস্থার ব্যবহারিক ভিত্তি হিসেবে এই দু'টি আদর্শকে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। কোনো বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ক্রমাগত ধর্মনিরপেক্ষতার ঢেঁড়া পিটোচ্ছে বলে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষা হচ্ছে এমনটা নয়। কারণ পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্ম দর্শন, জীবন দর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেখানে এই দু'টি আদর্শকে জোর করে যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি এমন অগুন্তি উদাহরণ দেওয়া যাবে কমিউনিস্ট শাসিত ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি থেকে। নিজেদের খাস তালুকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সুচগ্র মেদিনী না ছাড়লেও এই ব্যবস্থা যুগলের সুযোগ নিয়ে মাওবাদী ও জেহাদি ইসলাম আজ ভারতের মতো সহনশীল দেশে এমনভাবে শেকড় বিস্তার করেছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এদেশ থেকে এদের মূলোৎপাটন করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার।

একসময় বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা মাওবাদীরা কালের স্রোতে হারিয়ে যেতে বসলেও ইসলামের 'খাঁটি ব্র্যান্ড' নতুন করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন নিয়ে দুনিয়া কাঁপাতে চাইছে। আই এস আই এস, বোকো হারাম, আলকায়দা ছাড়াও অজস্র ছোট ছোট নরসংহারক গোষ্ঠী ইসলামের এই 'খাঁটি ব্র্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্বজুড়ে শুধু অমুসলমানদের নয়, রক্ত ঝরাচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়েরও। আলকায়দার ঘোষণা অনুসারে ইসলামের এই খাঁটি ব্র্যান্ডের নরসংহারকদের লক্ষ্যে এখন ভারত।

ভারতে জেহাদি ইসলামকে ইসলামের মূলস্রোত থেকে পৃথক করার প্রয়াস খোদ মুসলমান সমাজের শান্তিকামী অংশ থেকেও করা হয়নি। বরং সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না বলে এদেশে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের 'ইসলামিক সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্য'কে আড়াল করার চেষ্টা সবসময়ই হয়। ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সংখ্যালঘু মানেই দুর্বল, আর দুর্বলরা বঞ্চনা বোধ থেকে অপরাধ করে। ফলে দুর্বলদের কৃত শত অপরাধও ক্ষমার যোগ্য। সংখ্যালঘু সমাজের অপরাধের বিরুদ্ধে মুখ খোলা মানে ওদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সমাজের রোষ সৃষ্টি হয়ে ভারতের বহুত্ববাদী উদার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। এধরনের নানারকম তত্ত্বের সাহায্যে স্বভাবে উদার এদেশের জনমানস থেকে ইসলামিক সাম্প্রদায়িকতা ও জেহাদ তত্ত্বকে আড়াল করার চেষ্টা হয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক রক্ষা কবচ গড়ে উঠেছে যে এখানে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আমজনতা বা কোনো সামাজিক সংগঠনের মুখ খোলাটাও সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা বা অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কঠোরতাকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

বলে চিহ্নিত করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য বিশ্বে ভারত একটি প্রসিদ্ধ দেশ।

ফলে ধর্মের নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিকৃত ঁোড়ামিকে মূলধন করে এদেশে ক্ষমতা, অর্থ ও খ্যাতির মোহে মূলস্রোতের রাজনীতিক, মানবাধিকার কর্মী, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবীরাও যে জেহাদি ইসলাম ও নরসংহার মাওবাদীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের যাত্রা পথ সুগম করছে বর্তমান ভারতে এমন উদাহরণের অভাব নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই সমস্ত ভণ্ডামি দেখে মানুষ যে বিরক্ত হয়ে উঠেছে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো হিন্দুত্ববাদী শক্তির রাজনৈতিক জয়যাত্রাই একথা প্রমাণ করে দিচ্ছে। ফলে সবধর্ম সমভাবের রসায়নবাহী হিন্দুত্ববাদী শক্তি যাদের কারণে অকারণে সাম্প্রদায়িক বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হোত তাদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই বিকৃতির, ভণ্ডামির অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষ সন্ত্রাসবাদীদের' সংঘর্ষ অনিবার্য। দেশ ভাগের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ইসলামিক জেহাদিদের মৃগয়া ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় এই লড়াই চূড়ান্ত আকার নিতে চলেছে। একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে ইসলামিক সাম্প্রদায়িকতা ও জেহাদিদের প্রশ্রয়ের প্রশ্নে ৩৪ বছরের বাম শাসনের পরিপূরক মমতার তিন বছরের শাসন। বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মমতার রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জেহাদিদের অস্তিত্বের প্রশ্নও। ঠিক যেমন বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল শেখ হাসিনার আমলে কোণঠাসা হয়ে পড়া জামাত-সহ অন্যান্য জেহাদি গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব। বাংলাদেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে জেহাদিদের রুখতে হলে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে নাগরিক সমাজেরও বড় ভূমিকা আছে। ভারতভূমিতে জেহাদিদের রুখতে হলে নাগরিক সমাজকে সেই ভূমিকা পালন করতেও হবে। নাগরিক সমাজের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদীদের ছড়ানো জাল সম্পর্কে একবার হদিশ নেওয়া যেতে পারে।

গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী মাওবাদীদের তিনটি মুখ। একটি, ভূমিগত যাদের মূল কাজ ধ্বংস লীলা বা নরহত্যা চালিয়ে ভয়ের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা। আরেকটি, সিভিল সোসাইটির মাওবাদী মুখ অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল সেল। এরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, রাজনীতিক সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী এরকম নানা পরিচয়ে আমজনতার মধ্যে বসবাস করে। যাদের মূল কাজ হলো মানবাধিকারের ধুয়ো তুলে কিংবা মার্কসীয় শোষণ তত্ত্বের সাহায্যে মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীদের ঘটানো ধ্বংস লীলা বা নরহত্যার ঔচিত্য প্রতিষ্ঠা করা, প্রয়োজনে ভূমিগত গোষ্ঠীকে আইনি, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক শক্তি ও সাহায্য যোগানো। তৃতীয় মুখটি হলো এ আই সিসি আর (All India Coordination Committee of Revolutionaries)/ সিপি আই (এম এল) থেকে জন্ম নেওয়া বেশ কিছু প্রভাবহীন অতি-লাল রাজনৈতিক সংগঠন।

ঠিক একইরকমভাবে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের সামগ্রিক সত্তাটিকেও তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি অ্যাকশন সেল যারা প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস লীলা ও নরহত্যা চালায়। দ্বিতীয়টি স্লিপার সেল, যারা আমজনতার মাঝে সাধারণ নাগরিকের মতোই বসবাস করে গোপনে অ্যাকশন সেলের সদস্যদের থাকা, খাওয়া, যাতায়ত, যোগাযোগ এবং তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। তৃতীয়টি পলিটিক্যাল সেল, যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জেহাদিদের যোগ সাজসের প্রমাণ হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাজনীতির মূলস্রোতে এদের উপস্থিতি জেহাদিদের শক্তি যোগায়। জেহাদিরা যত বড় নরহত্যার ঘটনা বা ধ্বংসলীলা ঘটাক না কেন তাতে রাজনীতির রং চড়িয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চালায় এই সংগঠনগুলি। এই আড়াল করার প্রয়াসের প্রথম প্রদক্ষেপ হলো ফৌজদারি অপরাধে বা জেহাদি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে অভিযুক্তদের সঙ্গে সমগ্র মুসলমান সমাজকে জুড়ে দিয়ে মুসলমান নির্যাতনের আওয়াজ তুলে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা তৈরি করা। নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও ধর্মে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী সদস্য এই সমস্ত দলে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের জামায়েত, বিএনপি, পশ্চিমবঙ্গের জমিয়তে- উলেমা-হিন্দ, অসমে বদরুদ্দীন আজমলের এআইইউডিএফের মতো বিভিন্ন রাজ্যে আরো বেশ কিছু কট্টর ইসলামি-ধ্যান-ধারণার দলকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। জমিয়তে-উলেমা-হিন্দের প্রধান সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বর্ধমানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মঞ্চ বেঁধে গণতন্ত্রে মতপ্রকাশের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খাগড়াগর কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া জেহাদি জঙ্গীদের পাশে আইনি সহায়তা-সহ সবরকমভাবে দাঁড়ানোর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এনআইএ-র মাদ্রাসা তল্লাসির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিয়েছেন। গত ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় সমাবেশ করে তিন আই পি এস, ২৩ জন পুলিশ কর্মী ও সাংবাদিকদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালিয়ে গুরুতর জখম করে সিদ্দিকুল্লা বাহিনী প্রমাণ করে দিল যে ওদের নেতা সিদ্দিকুল্লার হুমকি ফাঁকা আওয়াজ নয়। ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় মুসলমান দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব প্রমাণ করে দিয়েছে যে মুসলমান নেতাদের হুমকির সামনে আমজনতা তো দূরের কথা খোদ প্রশাসন এমনকী কোথাও, পিন পড়লে তেড়ে ফুঁড়ে মাঠে নামা সংবাদমাধ্যমও কতটা অসহায়। কারণ যে পশ্চিমবঙ্গে কার্টুন আঁকলে বা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেও গ্রেপ্তার হতে হয়, সেখানে ২৯ নভেম্বরের ধর্মতলায় এত বড় তাণ্ডবের ঘটনায় এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তার তো দূরের কথা কোনোরকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি, এমনকী সংবাদমাধ্যমের কোনো অংশও এই নিয়ে হইচই করার সাহস পায়নি।

মুসলিম ভোটের জন্য কংগ্রেসের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেল সাঁটা কট্টরপন্থী মুসলমান সংগঠনগুলির সখ্যতা ও নির্বাচনী

আঁতাত গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। এই সখ্যতাকে মজবুত, বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য, মুসলিম মসিহা ইমেজ গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। এই সখ্যতাকে মজবুত, বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য, মুসলমান মসিহা ইমেজ গড়ে তোলার জন্য সোনিয়া, মমতা, লালু, মুলায়েম, জয়ললিতা, করুণানিধিদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ নেতানেত্রী ও বামপন্থী দলগুলি সুযোগ পেলেই এই কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর সুরে সুর মেলানোর প্রয়াস করবে, জেহাদি ক্রিয়াকলাপ ও মুসলমান দুষ্কৃতীদের ঘটানো অপরাধের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে নিষ্ক্রিয় থাকার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান মহিলার বেশ ধারণ করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মুসলমান সংরক্ষণের দাবি ওঠে, ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ড এবং সিদ্দিকুল্লার সাম্প্রতিক আস্ফালন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ইসলামিক জেহাদি ও কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলি ভারতকে দারুল ইসলামে পরিণত করার লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির এই দুর্বলতাকে একশ ভাগ কাজে লাগাচ্ছে।

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ধর্মনিরপেক্ষ নেতা-নেত্রীদের পক্ষ থেকে ১৯৯২-এর ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে এবং প্রতিবেশী ইসলামিক দেশগুলিতে সংখ্যালঘু এলাকায় যতগুলি নরহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাকেই অযোধ্যায় বিতর্কিত বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পাল্টা হিসেবে উপস্থাপিত করে ঔচিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা হয়েছে। একইরকমভাবে ২০০২-এর পর ভারতের মাটিতে ইসলামিক সন্ত্রসাবাদীদের ঘটানো ভয়ঙ্কর সমস্ত নরহত্যা, ধ্বংসলীলা এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জান-মান-সম্পত্তির উপর হামলার যাবতীয় দায় গুজরাট দাঙ্গার বদলা হিসেবে দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে।

২০০৮, ২৬/১১ মুম্বই হামলা যে গুজরাট দাঙ্গার বদলা এটা প্রমাণের সবরকম প্রয়াস চালিয়েছে পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। ঠিক একইরকমভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেল সাঁটা ভারতের বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে এটা বোঝানোর চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি যে গুজরাট দাঙ্গা না হলে ২৬/১১-এর মুম্বই হামলা আসলে পাকিস্তান নয়, আর এস এস বিজেপি-র চক্রান্তের ফল এবং এটিএস প্রধান হেমন্ত কারাকারের আসল হত্যাকারী হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা। ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তো ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী হানাগুলির ঔচিত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য হিন্দু সন্ত্রাসবাদের তত্ত্বও খাড়া করার চেষ্টা করেছিল।

২৬/১১-এর মুম্বই হামলা নিয়ে দ্বিগ্বিজয় সিং-দের কথার প্রতিধ্বনি শোনা

> **“সন্দেহ নেই সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি এমন একটি সংবেদনশীল, সাহসী জাগ্রত নাগরিক সমাজ চাই যারা ধর্মনিরপেক্ষতার জালে জড়িয়ে পড়া ইসলামিক সন্ত্রাসের শেকড় ছিন্ন করার জন্য সমাজকে সচেতন করবে।”**

গেল ২২/১১, ২০১৪ তারিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ যে আন্তর্জাতিক ইসলামী জেহাদি ষড়যন্ত্র এবং শিমুলিয়ার মতো বিভিন্ন অনুমোদনহীন মাদ্রাসা যে আসলে ইসলামি ফিদাইন প্রশিক্ষণ শিবির এই বিষয়টি আজ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ তদন্তে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। এই কাণ্ডে শুধু ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নয় বাংলাদেশেও গ্রেপ্তার হয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। তা সত্ত্বেও গত ২২ নভেম্বর শনিবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের কর্মীসভায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "খাগড়াগড়ে হয়তো কেন্দ্রই 'র'-কে দিয়ে বোমা রাখিয়েছে। মনে রাখবেন, আমি ২৩ বছর কেন্দ্রে ছিলাম। কে কী ভাবে ষড়যন্ত্র করে সব জানি।" যার অর্থ এটাও দাঁড়ায় অতীতে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা মমতাও 'র'-এর এই ধরনের অপকীর্তির শরিক ছিলেন।

মমতার দলের রাজ্যসভার সদস্য ডেরেক সাহেব বললেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল আর এস এসের লোকও এই ঘটনার ষড়যন্ত্র আর এস এস সদর দপ্তরে বসেই হয়েছিল। মমতা ও ডেরেক সাহেব যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন সেই মুহূর্তটিতে বাংলাদেশের জামায়েত শিবির, বিএনপি শিবিরে যে বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাসের ছড়িয়ে পড়েছিল সে খবরও সংবাদপত্রে এসেছে। অবশ্য আনন্দ হবে নাই বা কেন? পাকিস্তান, বাংলাদেশে ইসলামিক উগ্রপন্থীরা নাশকতা ঘটিয়ে এগুলিতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হাত রয়েছে বলে প্রচারের ঝড় তোলে। ফলে 'র' নামে ভারতের একটি গোয়েন্দা সংস্থা আছে এটা ভারতীয়রা না জানলেও বাংলাদেশি পাকিস্তানিরা ভালোভাবেই জানে। খোদ ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদমর্যাদার একজন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রধান ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের প্রচারের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সেরে দিল এতে বাংলাদেশের হুজি, জেএমবি, জামায়েত, বিএনপি ও পাকিস্তানের আই এস আই, আলকায়দা,

লস্কর-ই-তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন শিবিরের লোকেরা খুশি হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক প্রধান ওঁর নিজের দেশের গোয়েন্দাদের উপর দোষ চাপিয়ে বাংলাদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে দেখেই ওরা উল্লসিত হচ্ছে এটাও হতে পারে।

খাগড়াগড় কাণ্ড সামনে আসার পর থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে এরকম বক্তব্য উঠে আসছিল যে বাংলাদেশের হুজি, জেএমবি জামায়েত জঙ্গিরা হাসিনা সরকারের রোষানল থেকে বাঁচতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে, এ রাজ্যের মাটিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে ইসলামি শাসন কায়েমের মতো তাৎক্ষণিক লক্ষ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসমকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের মতো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক তৈরি করতে দেওয়ার বিনিময়ে এই জঙ্গিরা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচনের সময় প্রত্যক্ষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে মমতাকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত সিমির প্রতিষ্ঠাতা হাসান ইমরানের তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য হওয়া ও মমতার মুখে এই 'র' তত্ত্ব প্রকাশ্যে উচ্চারিত হওয়ার পর বাংলাদেশি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে মমতার গোপন রাজনৈতিক আঁতাতের অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের প্রভাবে ইসলামি জেহাদিরা শুধু ভারতের রাজনীতিক, সরকার ও প্রশাসনকেই নয়, পেট্রোডলারের প্রভাবে নাকি নিয়ন্ত্রণ করছে কিছু এনজিও, মিডিয়া গোষ্ঠীকেও। যেমন, বন্দিমুক্তি কমিটির ব্যানারে সুজাত ভদ্র গত ২৮ অক্টোবর ২০১৪ কলকাতায় প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা করেছেন খাগড়াগড় কাণ্ডে আলিয়া বিবি ও রাজিয়া বিবিদের গ্রেপ্তার আসলে এ রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কমিটি এই দুই মহিলাকে জেল থেকে মুক্ত করা ও এন আই এ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি ঘোষণা করছে। মমতার আরেক প্রাক্তন সাকরেদ কবির সুমন তো খাগড়াগড় কাণ্ডকে কেন্দ্রের মুসলমান বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে প্রয়োজনে বর্তমানে গুরুতর অপছন্দের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন।

এই প্রশ্নটি কিন্তু প্রত্যেকেই আলোড়িত করে এখানে যাদের কৃতকর্ম জেহাদিদের প্রশ্রয় দেয় ও আড়াল করে ওঁরা সবাই তো এই সমাজেরই চিন্তাশীল দায়িত্বশীল নাগরিক বলে পরিচিত প্রতিষ্ঠিত। তাহলে একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বে অস্থিরতা ও ঘটে চলা নরহত্যার জন্য দায়ী মাওবাদী ও জেহাদি ইসলামের বিপদ এই মানুষগুলিকে কি একবারও ভাবায় না? আমার মনে হয় ভাবায়, কিন্তু ক্ষমতা অর্থ ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারার জন্যই এরা বিপথগামী।

ইসলামিক জেহাদিদের এই ধর্মনিরপেক্ষ মুখগুলি যে জেহাদিদের কতটা ভরসা যোগায় তা খাগড়াগড় কাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড বাংলাদেশি নাগরিক সাজিদের একটি উক্তি উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর সাজিদ বলে ছিল ওকে আর যাই করুক অন্তত বাংলাদেশের হাতে যেন তুলে দেওয়া না হয়। বাংলাদেশের হাতে যাওয়া মানে ওই দেশের বিচারে ফাঁসিও হতে পারে এবং ফাঁসির পর অন্যান্য জেহাদিদের মতো ওইদেশের মাটিতে কবর দেওয়া নিয়েও আপত্তি উঠতে পারে। আর ভারতে ফাঁসি হওয়া যেমন কঠিন তেমনি ফাঁসি হয়ে গেলেও এখানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বন্ধুরা শহিদ বেদি বানাবে এমন সম্ভাবনাও আছে। যেমন, ২৬/১১-এর নায়ক কাসভের মৃতদেহ ঠিক এই ভয়েই গোপনে কবরস্থ করা হয়েছে। সাজিদের বক্তব্য থেকে এটা মনে করা যেতেই পারে যে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে তাদের ইহকাল এবং পরকাল সুরক্ষিত বলে মনে করে। মাওবাদীদের সিভিল সোসাইটির মুখের মতো জেহাদিদের মনে এইরকম সুরক্ষার ভাব সৃষ্টিকারী ধর্মনিরপেক্ষতার তকমাধারী সিভিল সোসাইটির মদতদাতারা প্রত্যক্ষ নরহত্যাকারীদের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। জেহাদিদের বন্দুক গোলা দিয়ে মোকাবিলা করা গেলেও সমাজের মূলস্রোতে সবার মাঝে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ালেও এই মদতদাতারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

২৬/১১-এর মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রে ও রূপায়ণে পাকিস্তান রয়েছে এটা আজ প্রমাণিত। এই কাণ্ডে জ্যান্ত ধরাপড়া পাকিস্তান জঙ্গি কাসভের ফাঁসিও হয়ে গেছে। কিন্তু এই হামলার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে পরোক্ষে কাসভের মতো জেহাদি জল্লাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' দিগ্বিজয় সিং-এর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। বরং দিগ্বিজয় সিংদের জেহাদি ভোটার ভিত্তি আরো শক্তিশালী হয়েছে। খাগড়াগড় কাণ্ডেও অভিযুক্ত সাজিদ, খালিদ, আব্দুল হাকিম, আলিয়া বিবি, রাজিয়া বিবিদেরও বিচার হবে, শাস্তি হবে কিন্তু বহাল তবিয়তে সমাজের মূলস্রোতে রাজত্ব করতে থাকবে এদের সিভিল সোসাইটির মুখ মমতা, সিদ্দিকুল্লা, বিনায়ক সেন, সুজাত ভদ্ররা। এদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা হবে কারোর? কারণ এদের গায়ে যে ধর্মনিরপেক্ষতার আলখাল্লা। ভারতকে ইসলামি রাষ্ট্র তৈরির জন্য ক্রিয়াশীল বোকো হারাম, আই এস আই এস, আলকায়দার ছক অনুসারে আবার সামনে আসবে কাসভ, সাজিদ, খালিদ, আব্দুল হাকিম, আলিয়া বিবি, রাজিয়া বিবিদের নতুন মুখ। আবার হয়তো নতুন করে তৈরি হবে ২৬/১১-এর মুম্বই, বর্ধমানের খাগড়াগড়ের মতো নতুন নতুন বধ্যভূমি। আর সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এদের পাশে চিরকাল দাঁড়াবে দিগ্বিজয়, মমতা, সিদ্দিকুল্লা, সুজাত ভদ্ররা। সন্দেহ নেই সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি এমন একটি সংবেদনশীল, সাহসী জাগ্রত নাগরিক সমাজ চাই যারা ধর্মনিরপেক্ষতার জালে জড়িয়ে পড়া ইসলামিক সন্ত্রাসের শেকড় ছিন্ন করার জন্য সমাজকে সচেতন করবে। ■

কেন্দ্রকে অবহেলা করে রাজ্যের উন্নতি সম্ভব ?

ড. ভাস্কর পুরকায়স্থ

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। সারকারিয়া কমিশনসহ বহু গবেষণা ও জ্ঞানগর্ভ মতামত পেশ করা হয়েছে। বাস্তবে সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা, শিল্প, পুলিশ-প্রশাসন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিধানসমূহ মেনেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক চলছে। রাজনীতিতে শিক্ষিত, সংবেদনশীল ও পরিশীলিত, সৎ ও ত্যাগ মানুষের প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অবস্থায় আইন, এক্তিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে মান্যতা ক্রমশই কমছে। অথচ ভারতরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দু' জায়গার সরকারেরই সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি রয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ, সুরক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে রাজ্য বিশেষত কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রও সীমা, জাতিগত সম্প্রীতি রক্ষা, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যর ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

সংবিধান আইনসম্বন্ধীয়, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র- রাজ্য বিষয়ে তালিকা তৈরি করেছে। (ধারা ২৪৫-২৯৩) কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকায় আইনসম্বন্ধীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছে, যাতে একে অপরের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে। কো-অপারেটিভ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করতে সংবিধানের ২৬৩ ধারায় আন্তঃরাজ্য পরিষদ ও জোনাল পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা যেমন— জলবন্টন, পুলিশ প্রশাসন, শিল্প উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের অবনতি সাধন করেছে। অপরপক্ষে কিছু রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহ কেন্দ্রের সঙ্গে রিরোধে প্রায় লিপ্ত হয় না বললেই চলে। সাম্প্রতিককালে মহারাষ্ট্র নির্বাচনের ফলাফলের পর বিজেপি সরকার গঠনে এন সি পি-র ভূমিকা রাজ্যের স্বার্থের অনুকূলে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্টের রাজত্বে কেন্দ্র- বিরোধিতা প্রায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পর্যায়েই চলে গিয়েছিল, কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে মুখর রাজনীতির প্রাঙ্গণ। কিন্তু ক্রমশ বাকি ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের তুলনায় সাংঘাতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। গুজরাট, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এমনকী কেরল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজ নিজ রাজ্যের অগ্রগতি ঘটিয়েছে। কেরল প্রায় পালা করেই একটি নির্বাচন অন্তর তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস-শাসিত দলের জোটের সঙ্গেই থেকেছে। বামফ্রন্ট- শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলেছে। অতি সাম্প্রতিককালে, প্রধানমন্ত্রীর সফর কালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শিষ্টাচার দেখিয়েছেন।

কেন্দ্র-বিরোধী জনমত তৈরিতে প্রথমস্থানে হয়তো পশ্চিমবঙ্গই থাকবে, বিধানচন্দ্র রায় পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রবিরোধী মানসিকতা সেই যে তৈরি করা হয়েছে সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য সে সময়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে অনেক এগিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বদাই কেন্দ্র-বিরোধী মনোভাব বজায় রেখে সুযোগ- সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হয়তো সহজ হয়েছে এবং রাজনৈতিক লাভ হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের ইমেজ নষ্ট হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের কমপিউটার-বিরোধিতা, ইংরেজি ভাষা বিরোধিতা বাংলাকে অনেক বঞ্চিত করেছে, বাংলার মেধা নষ্ট হয়েছে। বেকারি বেড়েই চলেছে। শিল্পস্থাপন হচ্ছেই না, উপরন্তু শিল্পের পলায়ন চলছে।

বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পরই তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। ক্রমে সেই দলের সঙ্গে জোটও ভেঙে গেছে। অর্থাৎ একলা চলরে...। কেন্দ্রে বর্তমান সরকার আসার পর যথারীতি বিরোধিতা চলছে। এই সুযোগে অন্যান্য রাজ্যগুলি নিজ নিজ

রাজ্যের উন্নতিতে সুযোগ সন্ধানে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে।

পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক ভালই ছিল। মহাত্মা গান্ধী, নেহরুর কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর রাজনৈতিক কথাবার্তাও হত। সৃষ্টিশীলতা, পরিশীলিত মানববোধ সাহিত্য ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছিল। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে বিধানচন্দ্রের পরবর্তীকালে কোনো রাজনৈতিক দলই কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলেনি। অবশ্য বামফ্রন্ট সুদীর্ঘকাল শাসনে কেন্দ্র-বিরোধিতার ভান ধরে সাধারণ মানুষকে ভোট বাক্সে প্রলুব্ধ করেছে এবং একই সঙ্গে দিল্লীতে শাসকদলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে রাজ্য শাসন করে গেছে। বর্তমান রাজ্য সরকার একই পথে ক্ষমতায় এসেছিল, অর্থাৎ কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই। যদিও বিরোধীদল ও ক্ষমতায় থাকা অবস্থা দু'টি সম্বন্ধে সঠিক দিক্‌নির্দেশ না থাকায় এবং সারদা কাণ্ডের দুর্নীতির প্রকোপে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকছে না।

প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্ক থাকলেই কি রাজ্যের উন্নতি সম্ভব? একথা অনস্বীকার্য সে একই দল কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলে উন্নতির পক্ষে অবশ্যই সহায়ক। দলীয় গণতন্ত্রে নিজ নিজ দলের সরকারের প্রতি অধিক নির্ভরতা থাকা আশ্চর্য নয়। কারণ কেন্দ্রের সরকারের শক্তিও রাজ্যের শক্তির উপরই নির্ভরশীল। বর্তমান মোদী সরকারের রাজ্য সভায় গরিষ্ঠতা না পাওয়া পর্যন্ত মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়গুলি বিরোধীরা কিছুতেই পাশ করাতে দেবে না। দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের বয়স নিয়ে আসা বিজেপি সরকারের কাছে একটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সরকার থাকলে পরিকল্পনা রূপায়ণ সহজ হয়। দু' সরকারের একই দলের নেতৃবৃন্দ পরস্পরকে বেশি ভরসা ও বিশ্বাস করতে পারেন। অর্থাৎ উন্নয়নের কার্যক্রম রূপায়ণে অধিক গতিবেগ আনা সম্ভব হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজ্য এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসেরই শাসন ছিল, দুর্নীতি, সন্ত্রাস না থাকার ফলে সেই সময় রাজ্যগুলি রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কালক্রমে নীতিহীন রাজনীতির দাপটে আঞ্চলিক দলগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৭৭ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতি আঞ্চলিকতার শিকার হয়ে সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতরাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। সাম্প্রতিককালে দুর্নীতির লাগামছাড়া থাবায় নাকাল মানুষ কেন্দ্রে পরিবর্তন করে রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ছয় মাসে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনেও বিজেপি বিপুল সমর্থন পেয়ে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পাচ্ছে। ক্রমে আঞ্চলিক দলগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। কারণ কেন্দ্র-বিরোধী প্রচারে রাজ্যগুলির অপদার্থতা ঢাকার চেষ্টা মানুষ বুঝতে পারছেন।

রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী হামলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কেন্দ্রের- বাহিনী এবং অর্থসাহায্য ছাড়া মোকাবিলা করা দুষ্কর। সংবিধান এবং বিভিন্ন আইন মোতাবেক অর্থনৈতিক ও সুরক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের হাতে বেশি ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়নের দেখাশোনা ও মান-নির্ধারণের ব্যবস্থাসমূহ কেন্দ্রের হাতেই রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্রের মূল্যায়ন গুরুত্ব সহকারে পালন করলে আখেরে রাজ্যগুলিরই লাভ।

পশ্চিমবঙ্গের মতো সর্বাধিক ঘন জনবসতি পূর্ণ, আর্থিকভাবে অনুন্নত রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে কেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। সাম্প্রতিককালে বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ড ও সারদা কেলেঙ্কারির পর এই প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়েছে। অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি রোধেও কেন্দ্রের সাহায্য প্রয়োজন। সমস্যা জর্জরিত, কৃষিনির্ভর এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন পরিকল্পনার লাভ গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষেই ভাল। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর, স্কুল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজ্যের প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা তুলনা করলেই উৎকৃষ্টতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কয়েকটি রাষ্ট্রের সীমানা জড়িত। অতএব এই রাজ্যের সুরক্ষা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক মধুর হওয়া প্রয়োজন। যেমন ভারত-বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে ৫৪টি নদীর জল ব্যবহার করে। জলসম্পর্ক উন্নয়নে, বাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে ও অন্যান্য সমস্যা নিরসনে যেমন ছিটমহল ইত্যাদির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উচিত কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে রাজ্যের উন্নতির সোপান তৈরি করা। জেহাদি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে রাজ্যের মানুষকে বাঁচাতে ও আগামীদিনের বলিষ্ঠ ও পরাক্রমী বাংলা গড়তে কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উন্নয়নের প্রতিযোগিতাই বাংলার মানুষকে সঠিক দিশা দেখাতে পারে।

(লেখক নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যাপক)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

রাজ্যের অধিকারে আঘাত হানার অভিযোগ শুধু মমতা সরকারেরই

ভাস্কর ভট্টাচার্য

'বিনাশকালে বুদ্ধি নাশ'— এই কথাটি এখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও ওনার বিচার বুদ্ধির গভীরতা নিয়ে এই লেখকের মনে সংশয় আছে। আজকাল, বিশেষ করে সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করার পর থেকে তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর ভাষার মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গ যে সাংস্কৃতিক আধারের মধ্যে আবদ্ধ, তিনি তার থেকে শতহস্ত দূরত্বে অবস্থান করছেন।

বর্তমানে তাঁর মুখে প্রায়শই শোনা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মমতাজীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে ধ্বংস করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা Federal structure-এর কথা বলা আছে আমাদের সংবিধানের ১০নং পরিচ্ছদে যেখানে এই ব্যবস্থায় ক্ষমতাকে ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা আছে, যা তিন ভাগে বিভক্ত— কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যৌথ তালিকা (Union list, State list & Concurrent list)। কেন্দ্রীয় তালিকায় ১০০টি ব্যবস্থা বা আইটেম আছে, রাজ্য তালিকায় ৬১টি ব্যবস্থা রয়েছে আর যৌথ তালিকায় ৫২টি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য তালিকায় যে ৬১টি আইটেম বা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, জমিনীতি, বিদ্যুৎ ও গ্রামপরিচালন ব্যবস্থা। আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখতে পাচ্ছে যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের পুরোনো যোজনা কমিশনকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিলুপ্ত করার কথা ঘোষণা করে নতুন একটি ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন— আগে যোজনা কমিশন কোন খাতে কত খরচ রাজ্য করতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে দিত। ফলে সেই খাতে খরচ না হলে তা অন্য খাতে খরচ করা যেত না। টাকা কেন্দ্রের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হোত। বর্তমান যে ব্যবস্থার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাতে একটা থোক টাকা রাজ্যকে দেওয়া হবে যা বিভিন্ন খাতে খরচ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বারবার তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাঠাচ্ছেন এই রাজ্যে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যের উন্নতির প্রশ্নে সহযোগিতার জন্য। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা পুরমন্ত্রী কেউই সেই সহযোগিতা গ্রহণে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় নগরউন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতও পুরমন্ত্রী বা রাজ্য নগরউন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম করলেন না।

এরপর কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ তোলেন। আসলে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। যখন দেখলেন মুলায়ম, লালুপ্রসাদ, নীতিশকুমার, জয়ললিতারা তাঁকে খুব একটা

পাত্তা দিচ্ছেন না, তখন তিনি মনে করেছিলেন কেন্দ্রে হয়ত একটা মিলিজুলি সরকার হবে এবং উনি সেই সরকারের চালিকাশক্তি হিসাবে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা নিরাশায় পরিণত হলো যখন নরেন্দ্র মোদী বিজেপিকে কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সরকার গঠন করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় বিজেপি সরকার আঘাত হানছে এই তত্ত্ব অন্য কোনো রাজনৈতিক দল আনছেন না— শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ছাড়া। এন আই এ খাগড়াগড় কাণ্ডে যখন সক্রিয় হলো তখন তিনি তার পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর প্রশাসনের পুলিশবাহিনী দ্বারা। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা সামনে আসতে কেন্দ্র বাধ্য হয়ে এন আই এ-কে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য তৎপর হয়। সেটাই ওঁর রাগের কারণ। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ এখন বুঝে গেছেন যে আমাদের রাজ্যের অপরিণামদর্শিতার জন্য কিভাবে সন্ত্রাসবাদীরা এখানে বিভিন্ন জায়গায় (মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) তাদের ডেরা তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে তৃণমূলের নেতাদের যোগসাজস আজ আমাদের সামনে আসতে শুরু করেছে। আর এই অশনি সঙ্কেত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই পেয়েছিলেন। তাই যেভাবে সারদা কাণ্ড আটকাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সিবিআই-কে সারদার কেস থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন সেই একইভাবে এনডিএ-কেও আটকাতে তৎপর ছিলেন। সেটা ব্যর্থ হওয়াতে রাজনীতিকভাবে কোণঠাসা এই সরকারের অস্তিত্ব জনমানসে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে আটকাতে এখন চীৎকার করছেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে মোদী সরকার আঘাত করছেন। তাঁর এই সস্তার রাজনীতি, তোষণের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর রাজনীতিকে আজকের পশ্চিমবঙ্গবাসী ধরে ফেলেছেন।

আমরা অবাক হচ্ছি এই দেখে যে তাপস পালের মতো কলঙ্কিত সাংসদও সংসদে ধর্না দিচ্ছেন অপসংস্কৃতির ধুয়ো তুলে এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। যেভাবে ভাষার সন্ত্রাস এই তৃণমূলের নেত্রী থেকে সাংসদরা শুরু করেছেন, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় মাথা লুকোবার ঠাঁই পাবে না। যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোয় সংবিধানকে রক্ষা করা সরকারের প্রধান কর্তব্য। অথচ এই তৃণমূল সরকার সংবিধানের প্রতিটি স্তম্ভকে রাজ্যে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আদালত বার বার তিরস্কার করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে যে সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশন আজ ক্ষমতাহীন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত, আইন প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে অপারগ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আজ খর্ব করা হচ্ছে। যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনি সংবিধানের মূলমন্ত্র গণতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেছে। তাঁর রাজ্যের প্রতিটি মন্ত্রী ও বিধায়করা আজ স্তাবক ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং, আসল বিচার করবে জনগণ, যারা প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী এবং বিচার-বিবেচনা করে তাঁরাই আগামীদিনে এই সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, যাকে একদিন তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কাণ্ডারী হিসাবে। মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। মমতাদেবী আপনি যতই গলাবাজি করে নিজের দলকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন না কেন, আর বেশি দেরি নেই। 'তোমারে বধিবে যে সারদায় বেড়েছে সে'।

(লেখক একজন আইনজীবী)

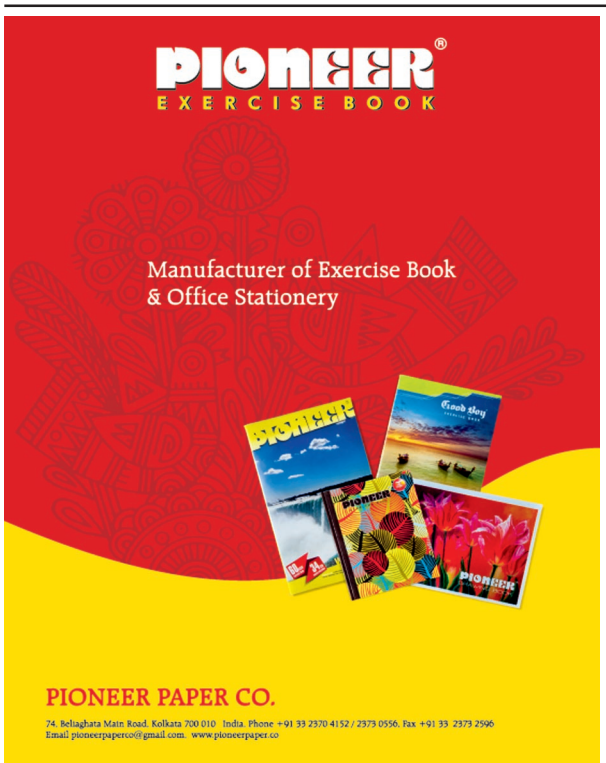

নেত্রদান মহাদান

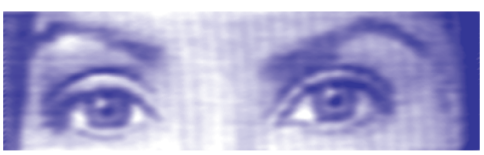

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে বিশ্ব দখল

একদা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছিলেন, ‘সংখ্যালঘুদের মোদীকে ভয়ের কারণ আছে’ ('Minorities have reason to fear Modi' (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৩০ এপ্রিল ২০১৪)। এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর।

ইতিহাস এই প্রমাণেই পরিপূর্ণ যে একটি অসেমেটিক দেশে সেমেটিক সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব অসেমেটিক জাতির মানুষেরই ভয়ের কারণ। এই সহজ-সরল কারণটি হলো সেমেটিক সংখ্যালঘু ধর্মান্তরকরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের তত্ত্ব ও প্রয়োগে বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নয়, এই তত্ত্ব তারা প্রয়োগ করে।

উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ এবং ২০০০ বছর সময়কালও যেমন সমস্ত ইউরোপে বাস করত প্যাগান জাতি। তারা মূর্তি ও প্রকৃতি পূজারী। রোমে তাদের সরকারি মন্দির ছিল। খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে খৃস্টানরা ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু (‘tiny minority’)। প্রথম খৃস্টান সম্রাট কন্স্ট্যানটাইনের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু খৃস্টানরা ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরকরণ করে সংখ্যাগুরু প্যাগনদের যারা অসেমেটিক এবং ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী ছিল না। মূর্তি-পূজারী প্যাগান ইউরোপ যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খৃস্টান ইউরোপ হয়ে গেল তার মূলে ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু খৃস্টান।

আফগানিস্তানে আদি অধিবাসীরা ছিল হিন্দু। এক সময় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু মুসলমান আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। সবুক্তিগিন গজনিতে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন। মুসলমানদের চরম উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা। তারা হিন্দুদের আফগানিস্তানে মুসলমান করতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে এইভাবে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে চালিয়ে তারা হিন্দুসংখ্যা কমিয়ে করুণ অস্তিত্বহীন করে ফেলেছে সেখানে। বর্তমানে শতকরা ৯৯ শতাংশ আফগান হিন্দুকে মুসলমান করে ফেলেছে।

চিঠিপত্র

বাংলায় মুসলমান সমাজই ছিল না যখন ১২০৪ সালে বক্তইয়ার খিলজী বাংলা দখল করেন। মুসলমান শাসকদের ছত্রছায়ায় মুসলমান ধর্মান্তরকরণ কাজটি সহজ হয়। যদিও শুরুতে মুসলমানরা ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ১৮৭২ সালের প্রথম জনগণনায় দেখা যায় যে বাংলার ১৫টি জেলায় (মোট ৩১টি জেলা) মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। বাংলা তথা ভারত ভাগ কখনই হোত না যদি ধর্মান্তরকরণকারী সেমেটিক মুসলমান সংখ্যালঘু জাতি বাংলায় না থাকত। পৃথিবীর দেশে দেশে প্রথমে খৃস্টান ও মুসলমানরা সংখ্যালঘুই ছিল। ধর্মান্তরকরণ করে করে তারা সংখ্যাগুরু অসেমেটিকদের করুণ সংখ্যালঘুতে পরিণত করে, তাদের দেশ দখল করে, অসেমেটিক সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম বিনাশ করে। কিন্তু অসেমেটিক সংখ্যালঘু, যারা তত্ত্ব ও প্রয়োগে ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী নয়, যেমন ভারতের পার্সিরা, তাদের ভয় করার কোনো কারণই নেই।

সুতরাং, আমি অধ্যাপক সেন মহাশয়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বলতে চাই যে যদিও আজ ভারতে মুসলমান ও খৃস্টানরা সংখ্যালঘু, হিন্দুদেরই সংখ্যালঘু খৃস্টান ও মুসলমানদের ভয়ের কারণ আছে। কারণ তাদের চরম লক্ষ্য হলো ধর্মান্তরকরণ যা এক দীর্ঘকালীন বিরামহীন প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা।

সুতরাং দীর্ঘকালীন ইতিহাসের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ অনুসারে আমি বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করতে এবং সমস্ত মুসলমান ও খৃস্টান মিশনারি কাজ বন্ধ করতে অনুরোধ জানাই। তা না হলে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরে মুসলমান ও খৃস্টান দেশ হয়ে যাবে। সুতরাং সংখ্যালঘুদের ‘মোদীকে’ ভয়ের কারণের পরিবর্তে হিন্দুদেরই মুসলমান ও খৃস্টান সংখ্যালঘুদের ভয়ের কারণ আছে যাতে ভারতের আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষা পেতে পারে।

—ড. শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার,
দমদম, কলকাতা।

সাম্প্রদায়িক কারা?

আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির যেন রাতের ঘুম চলে গিয়েছে। তাঁদের মুখে একটাই রব যে এই সরকার ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। একটা বাস্তব কথা তাঁরা হয়তো বিশ্বাস করেন কিন্তু ভোটের রাজনীতির জন্য প্রকাশ করতে পারেন না তা হলো ভারতবর্ষের মূল সংস্কৃতি হলো হিন্দু সংস্কৃতি। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বহিরাগত জাতি আক্রমণ করেছে। তারা ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছে, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতিকে একেবারেই নষ্ট করতে পারেনি।

আজও সংস্কৃতিগতভাবে প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পার্থক্য বুঝতে পারেন না বা হয়তো বুঝেও বুঝতে চান না। বাঙালিরা কেউ কর্মসূত্রে দক্ষিণ ভারতে যেতে পারেন। সেখানে গিয়ে নিজেদের পোষাক-এর পরিবর্তন আনতে পারেন কিন্তু দুপুরে ভাত খেতে পারলে সবচেয়ে আনন্দিত হবেন। এখানে যদি পোষাকটিকে ধর্ম ধরি তবে ভাত খাওয়াটা সংস্কৃতি।

অথচ আমাদের দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি চিরকালই হিন্দু-সংস্কৃতির ওপর আঘাত আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কোথাও কোনো মুসলমান বিপদে পড়লে তারা রৈরৈ করে ওঠেন। অথচ বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডে ইসলামিক মৌলবাদিদের হাত-এর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা এর পিছনে ‘র’-এর হাত বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল করেন অথচ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে তারা একটিও শব্দ উচ্চারণ করেন না। হিন্দুদের ওপর এইরকম বৈমাতৃসুলভ আচরণকারী এই সব তথাকথিত

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে কি প্রকৃতপক্ষেই ধর্মনিরপেক্ষ বলা যাবে?

—রাহুল চক্রবর্তী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

চিত্তরঞ্জন সুতার ও ঐশ্লামিক বাংলাদেশ

স্বস্তিকার পূজা সংখ্যায় (২০১৪) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান শিরোনামে অচিন্ত্য বিশ্বাসের দীর্ঘ নিবন্ধটিতে লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কারণ অনেক গবেষক চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান অস্বীকার করা বা খাটো করে দেখাবেন। ঐশ্লামিক বাংলাদেশে এটা স্বাভাবিক। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যেদিন বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলা বা ঐশ্লামিক বাংলাতে বিবর্তিত হলো, সেদিনই পূর্ববাংলার ইতিহাস শুধু ঐশ্লামিকময় হয়ে গেছে। ইসলামের ভাষায় কাফেরদের স্থান নরকেই থাকবে, ইতিহাসে নয়। তা সে যতই গৌরবময় হোক না কেন।

বাংলাদেশে প্রতিদিন হিন্দু মেয়ে ধর্ষিত, অপহৃত ও জোরপূর্বক বিবাহের শিকার হচ্ছে। বছরখানেক আগে সূর্য সেনের ৮০তম মৃত্যু তথা ফাঁসির দিবস উদযাপনের খবর এল না। হিন্দু সংস্কৃতি-সভ্যতা বা কোনো মহান কীর্তিকে বাংলাদেশে যে ঠাঁই দেওয়া হবে না, এটা তো স্বাভাবিক। তাই হিন্দু প্রধান খুলনা বা ৯৮ শতাংশ অমুসলমান জনসংখ্যার চট্টগ্রামকে সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী হিংস্রভাবে যে ঐশ্লামিকরণ করা হয়েছে, তা তো বাস্তব সত্য।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের বা ১৯৪৭ সালের আগের ইতিহাস পড়ানো হয় না, বাজারে কোনো বই-ই নেই বললে চলে, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববাংলার বিরাট অবদান যুক্ত ইতিহাস আর প্রচারের আলোয় আসেনি। ৪০-এর দশকে ভোলা জেলায় ১৩০ জন হিন্দু রমণী বৃটিশ বাহিনীর হাতে ধর্ষিত হয়। এই কলঙ্কিত ইতিহাস আজও অন্ধকারে থেকে গেল। তবে ঐশ্লামিক বাংলায় এই ভোলা জেলায় বারবার হিন্দু রমণী বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এসব নিয়ে কোনো গবেষণাপত্র বা সংবাদ সেভাবে দেখা যায় না।

শেষকথা, চিত্তরঞ্জন সুতার সম্পাদনায় 'ঐতিহাসিক মহাসঙ্কট' এক অমর কীর্তি। এছাড়া তুহিন বিশ্বাসের 'নির্যাতনের দলিল', তথাগত রায়ের 'বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা' বা নিখিলবঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘের 'আর্তনাদ' এবং সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় মাসিক 'মায়ের ডাক' পত্রিকা পড়লে বোঝা যায় চিত্তরঞ্জন সুতার-এর মূল্যায়ন কেন বাংলাদেশ করেনি বা করতে পারবে না, তা স্বাভাবিক ঘটনা।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব-মেদিনীপুর।

চোরের মা'র বড় গলা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ''রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করছে''— এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। কেন্দ্র বিভাজনের রাজনীতি ও দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে বলে মমতা যে অভিযোগ তুলেছেন তাও সর্বৈব মিথ্যে। তাছাড়া মুসলমানদের দিকে তর্জনীও তোলা হয়নি। ওসব কথা বলে বরং মমতাই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিকেই উস্‌কে দিয়েছেন। ভোটের স্বার্থে মুসলমানদের খুশি করতে চাইছেন। আর সেই কারণে তিনি চাইছেন না কী সত্য উদঘাটিত হোক? এন আই এ নিয়ে তাই কি তাঁর এত অস্বস্তি? অনুপ্রবেশ নিয়ে তিনি কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলেছেন। সীমান্ত দেখা ও রক্ষার দায়িত্ব নাকি কেন্দ্রের, অর্থাৎ বি এস এফ-এর। মানছি। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী, অনুপ্রবেশকারীরা এ রাজ্যের কোথায় অবৈধভাবে ডেরা গড়ছে, ঠাঁই পাচ্ছে, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, অস্ত্রাগার নির্মাণ করছে, অন্তর্ঘাত ঘটাচ্ছে, শাকিল গাজির ন্যায় লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এদেশের নাগরিকত্ব পাচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব কার? রাজ্যের নয় কি? সে দায়িত্ব রাজ্য পালন করেছে কি? আসলে এসব অভিযোগের একটাই অর্থ— 'চোরের মা'র বড় গলা।'

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৭ বর্ষ ১১ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে নালন্দার পুনর্জন্ম বিষয়ে চিঠিটি সময়োপযোগী। এটা শুধু একটা সংবাদই নয় ভারতের পক্ষে একটা অশনি সঙ্কেতও বটে। কেননা আলকায়দা বা মুসলমান মৌলবাদিদের এখন প্রধান লক্ষ্য ভারত। তাই একে নানা ভাবে ধ্বংস করা এদের একমাত্র লক্ষ্য।

পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ। ১৯৪৫-৪৭ সময়কালে তার দেখা একটি ঘটনার কথা লিখেছেন যা তিনি লাকসাম- চট্টগ্রাম রেল ভ্রমণে দেখেছেন। তবে আমার মনে হয় ছেলেটি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন এটা বোধ হয় ঠিক নয়। এটা কোনো মুসলমান সন্তানের সেই সময়ে সস্তা ধার্মিক সুড়সুড়ি দিয়ে অর্থ উপার্জনের কৌশল ছিল। বলছি এখানেই যে তখন বাংলার হিন্দু যুবকদের মানসিক অবস্থা এমনি করে ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে ছিল না। মুসলমানরা ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে কৌশল প্রিয় এটা ইতিহাস প্রমাণিত সত্য। তাই এমনি ঘটনা শুনে (যা অবাস্তব তা অবশ্যই) কোনো হিন্দু কোনোদিন মুসলমান হতে পারে না।

তবে পত্র লেখকের শেষ কয়েকটি লাইন আমাকে ব্যথিত করেছে। আলকায়দার হামলা থেকে ভারতের লাইব্রেরিকে রক্ষা করতে তিনি যে পথের কথা বলেছেন তা নেতিবাচক জয় হতে পারে। কিন্তু সে জন মনের প্রসার তা লড়াই করার চেতনাকে পঙ্গু করে। তা কারো কাম্য নয়।

তাছাড়া সহজ পথে কৌশলে জয় হাসিল হলে তা হবে আমাদের দেশের মত ভঙ্গ স্বাধীনতার সামিল। যা পেয়ে আমাদের লাভও হলো না আবার মেকী খুশি ভাবে বিভোর হলাম। চাই পূর্ণ স্বাধীনতা ও পূর্ণ অখণ্ড ভারতবর্ষ।

—মানিক চট্টোপাধ্যায়,
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি-৪।

আধুনিক বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার আদি ভূমি ভারতবর্ষ

অর্ক ব্যানার্জি

'ভারতবর্ষ' পৃথিবীর এমন দেশ, যে দেশে যুগ যুগ ধরে সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নত জীবনবোধ সারা বিশ্বের মানুষকে আলো দেখিয়েছে। যখন মিল, বেন্থামের মানবতাবাদ ও বাস্তববাদী চিন্তা ইউরোপকে একটু একটু করে মানবাত্মার উদ্বোধনে অনুপ্রাণিত করছিল; তার শত-সহস্র বছর আগে ভারতের ঋষিরা উপনিষদের মধ্যে দিয়ে মানবাত্মার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতে। মানুষকে অমৃতের পুত্র, মুক্ত এবং পূর্ণ বলার উদারতা এবং সাহস পৃথিবীর কোনো শাস্ত্রে, কোনো ধর্মের হয়নি। ঈশ্বর ও মানুষ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে ভারতে। আবার এই ভারতের মাটিকে অসাম্য-অনাচার-অধর্ম- অবিচার থেকে মুক্ত করতে যুগে যুগে ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে এসে দেখিয়ে গেছেন জীবনের লক্ষ্য-ব্রত এবং কর্তব্য কাকে বলে। এই পৃথিবীতে যত মহান দার্শনিক গ্রন্থ আছে, গুণগত বিচারে এখনো পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'র স্তরে উপনীত হতে পারেনি। কোনো দর্শনকে ছোট করছি না। কিন্তু গীতা সেই সমস্ত দর্শনের অখণ্ড চেতনা স্বরূপ। যা নিরন্তর মানবাত্মার উদ্বোধন ঘটিয়ে চলেছে। শুধু ভারতেই নয়, নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও আজ গীতা'র জয়যাত্রা অব্যাহত। সুতরাং বেদ-বেদান্ত-রামায়ণ এবং গীতা'র উচ্চ মূল্যবোধ আজ সারা পৃথিবীতে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। হিন্দু ধর্মের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, হিন্দু'র ধর্ম কখনোই মূলগত ভাবে বহির্মুখী নয়। সর্বদাই মানবাত্মার গভীর অন্বেষণ হিন্দু'র ধর্মের মূল কথা। মানুষ কোত্থেকে এল? সৃষ্টি রহস্য কি? মৃত্যু কি? পৃথিবীর সার্বিক বিনাশ-প্রলয়-স্তর থেকে স্তরে সভ্যতার বিকাশের ধারা নিয়ে যতরকম গবেষণা ভারতে ঋষিরা করেছিলেন, তা' আর কোনো দেশে হয়নি।

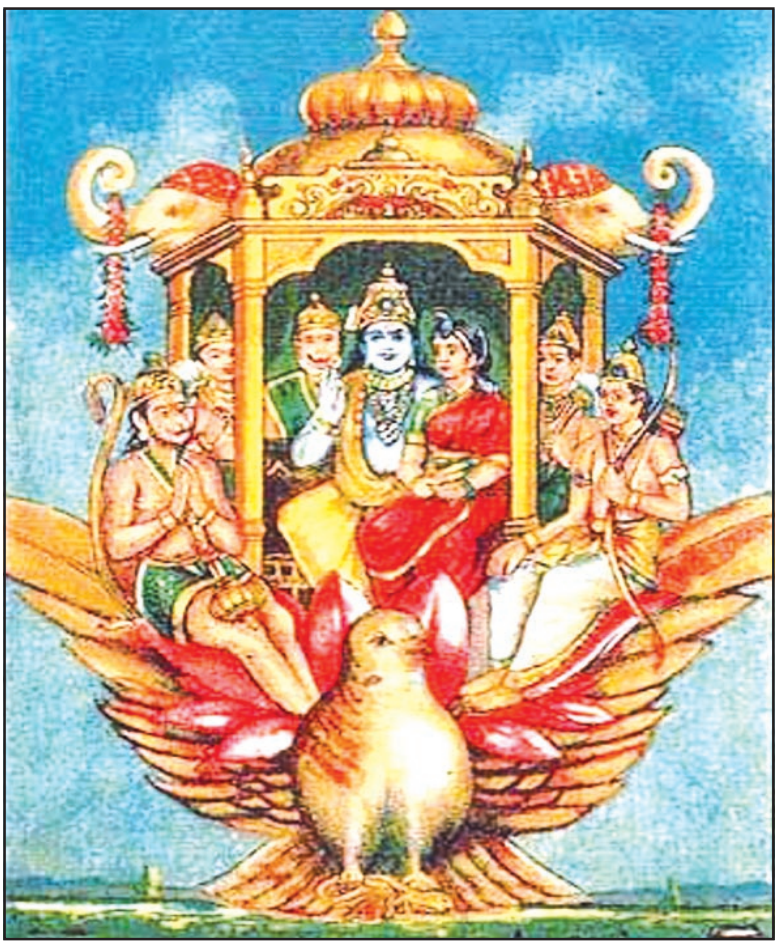

ভারত ছিল শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান কলাবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বের প্রাচীনতম শিক্ষা মন্দির এই ভারত। যুগে যুগে চীন জাপান পারস্য হিন্দুকুশ আরব গ্রীস আর ম্যাসিডন থেকে কত শত শিক্ষার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানপিপাসু মানুষ ভারতে এসে ধন্য হয়েছেন।

আধুনিক সমস্ত মতবাদ প্রাচীন ভারতেই প্রথম চোখ মেলেছিল। সাম্যবাদ, নাস্তিকতাবাদ, মানবতাবাদ, ঈশ্বরবাদ, গণতন্ত্র, লোকতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, ঋষিবাদ, জনকল্যাণবাদ, দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সবরকম চিন্তার জন্ম ও বিকাশ ভারতে ঘটেছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই শত শত সহস্র বছর আগে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিয়েছিলেন। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত, রামচন্দ্রের ওই সেতু আধুনিক সেতু নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করেই তৈরি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের কারিগরি ও নির্মাণ-শিল্প কত উন্নত ছিল তার প্রমাণ রামসেতু।

ডিপটিউবওয়েল বিদ্যা প্রাচীন ভারতেরও জানা ছিল। মহাভারতে ভীষ্মের শরশয্যার পাশে তীর মেরে অর্জুন

মাটিতে ছেদ করে সেই উৎস থেকে ভৌমজলের ব্যবস্থা করে পিতামহের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন। আসল কথা হলো— ডিপটিউবওয়েল ব্যবস্থা অর্জুনের জানা ছিল। মহাভারতের অনেক কিছুই রূপকের আকারে আমাদের কাছে এসেছে। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল অন্যরকম। অর্জুন আর অশ্বত্থামার শেষ যুদ্ধের বর্ণনায় ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রকটনের ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, উল্কাপাত প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। যা আধুনিককালে পরমাণু বিস্ফোরণের প্রাথমিক লক্ষণ। সুতরাং সেই মহাভারতের যুগেও পরমাণু অস্ত্রের অস্তিত্বও ছিল।

বর্তমানে দ্বারকার যতটুকু অংশ সমুদ্রের তলায় রয়েছে তা মার্কিন ও জার্মান গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে দ্বারকা ছিল একটি অত্যন্ত উন্নতমানের শহর। আধুনিক নগর সভ্যতার সবরকম নিদর্শনই প্রায় পুরাতন দ্বারকায় ছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই শহর চতুর্দিক থেকে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সুরক্ষিত থাকত। 'সুদর্শনচক্র' একধরনের বিশেষ রক্ষণা- বেক্ষণের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি যা শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করতেন। আবার সময় সময় শ্রীকৃষ্ণ এই আধুনিক অস্ত্র কৌশল যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শত্রু নিধনে ব্যবহার করতেন।

এরিকভন দানিকেন দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মত হলো দেবতারা আসলে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা এরাই দিয়েছিল। সময় সময় ওই বহির্বিশ্বের মানুষরা এই বিশ্বের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনেও জড়িয়ে পড়ত। এই ভাবেই দেবতাদের বংশে ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল ঋষি আর রাজর্ষিদের। বর্তমান গবেষণা বলছে— আফ্রিকা নয়, ভারতেই প্রথম মানুষের সৃষ্টি। পৃথিবীর সব জায়গায় একই সঙ্গে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। ভারতেই প্রথম মানুষের সৃষ্টি। 'Extra terrestrial Force or origin' থেকেই এই মানুষের সৃষ্টি। দানিকেন তাঁর গবেষণায় এইসব বিষয়ের উল্লেখ করেন। নভশ্চর বিদ্যাও প্রাচীন ভারতে অজানা ছিল না। একে বলা হোত 'বৈষ্ণবী বিদ্যা'। অর্জুন এই বিদ্যায় স্নাতক ছিলেন। বিশেষ বিশেষ সাধক, যোদ্ধা, আধ্যাত্মিক বিদ্যার্থীদের এই শিক্ষা দেওয়া হোত। 'সূর্যবিজ্ঞান' গ্রন্থে পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এই বিজ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে পবনপুত্র হনুমানজী সূর্যদেবতার কাছে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। এই কারণে অর্জুন মহাকাশে যাওয়ার কলাকৌশল জানতেন। হনুমানও এই বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশারদ ছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো শ্রীকৃষ্ণের গড়ুর রথ এক ধরনের স্পেসশিপ বা মহাকাশ যান। মহাভারতে গড়ুর কোথাও অবতরণ করলে পশুপাখী সব ছুটে পালাত। ঝোড়ো হাওয়া বইত আর আগুন বের হোত গড়ুরের পদতল থেকে। এখনকার মহাকাশযান আকাশে প্রেরণ কালে রকেটের নিচ থেকে প্রচণ্ড গতিতে জ্বালানি জ্বলে উঠে রকেটকে মহাকাশযান সহ আকাশসীমা ছাড়িয়ে মহাকাশে নিয়ে যায়। আশপাশে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। গড়ুরের পদতল থেকে তাহলে কি সেই জ্বালানি নির্গত হোত? ভরদ্বাজ ঋষি রচিত বিমানিকাশাস্ত্র প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতেও আকাশযান ছিল। 'বিমান' যা কিনা উড়তে পারে। রামায়ণে পুষ্পক বিমানের উল্লেখ আছে। পুষ্পক বিমানের দু'টি অংশ ছিল, একটি অংশ তিনজন চালক অন্য অংশে চারজন জ্বালানি সরবরাহকারী। বিমানের দোতলায় হলো যাত্রীদের জন্য বসার ব্যবস্থা। রাবণ এই বিমানে করেই দেবী সীতাকে অপহরণ করেছিল। কুবের ছিল যক্ষদের প্রধান। যক্ষ একটি এমন জাতি যারা মূলত দক্ষিণ ভারতের প্রান্তিক অংশে বাস করত। এরা বিজ্ঞানে উন্নত ছিল খুবই। বিমান তৈরির কৌশল এদের জানা ছিল। রাবণ কুবেরকে যুদ্ধে হারিয়ে ওই বিমান হাতিয়ে ছিল। পরে শ্রীরামচন্দ্র, ওই বিমান রাবণকে বধ করে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। পুষ্পক বিমানে করেই শ্রীরামচন্দ্র সীতা, হনুমানজী, সুগ্রীব, নল-নীল প্রমুখেরা অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। রামচন্দ্রের হাত ধরেই দক্ষিণ ভারতে কৃষিকার্যের বিস্তার ঘটে। পুরানো দিল্লীর পাশে ছিল প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ শহর। পাণ্ডবদের রাজধানী। এই স্থান ছিল শুষ্ক, জলহীন। শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলসেচ পদ্ধতি, বৃক্ষরোপণ, জলাধার নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এখানে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ জনপদ গড়ে ওঠে। রামায়ণ- মহাভারত এসব মোটেই মিথ্যে ছিল না। বৃটিশদের তৈরি বর্তমান ইতিহাস যা আমাদের দেশে পড়ানো হয় তাতে রামায়ণ ও মহাভারতকে মহাকাব্য-রূপকথার গল্প বলে প্রচার করা হয়েছে। কার্বোন ডেটিং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন দ্বারকা, হস্তিনাপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি শহরের বহু প্রাচীন এমন সব নিদর্শন পাওয়া গেছে যা রামায়ণ ও মহাভারতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বাস্তবতা প্রমাণ করে। কাল্পনিক ভাবে গাঁজাখুরির চর্চা এদেশে করা হোত না। বিষ্ণুর দশঅবতার ছিল বিবর্তনের প্রতীক। 'কৃষ্ণ' ভগবান হোন কিংবা নাই হোন; কৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। রামও কাল্পনিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের উপর ভারতীয় সভ্যতার ইমারত দাঁড়িয়ে। তাই এই দু'জনকে কাল্পনিক বলে যারা উপহাস করেন, তারা সরাসরি ভারতীয় সভ্যতাকেই অস্বীকার করেন।

'Cultural heritage of India' বইটি রামকৃষ্ণ মিশনের। 'কালচারাল হেরিটেজ' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের রসায়ন-পদার্থবিদ্যা- ভূবিদ্যা- চিকিৎসাবিজ্ঞান-শল্যচিকিৎসা-সামরিক বিজ্ঞান-খনিবিজ্ঞান- শব্দ ও আলো বিজ্ঞান কতটা উন্নত ছিল তা তথ্য প্রমাণ-সহ সঙ্কলিত হয়েছে বিভিন্ন পণ্ডিতদের লেখায়। সুতরাং প্রাচীন ভারতই ছিল আধুনিক সমস্ত দর্শন, কলা ও বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক ভিত্তি। উৎসকে অস্বীকার করে কোনো দিন বড় হওয়া যায় না।

সুতরাং আজ সময় এসে গেছে আমাদের মাতৃভূমির অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার। তা যদি না করি; তাহলে আমরা দেশদ্রোহী। ■

যে গানের আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলে

গানটা ছোটবেলা থেকে শুনছে দেবজিত। বাড়িতে শুনেছে। বাইরেও। কেউ একা গেয়েছেন একেবারে তন্ময় হয়ে। আবার কয়েকজন গেয়েছেন একসঙ্গে। দু'ভাবে শোনাই ভালো লেগেছে। পরে বাবা এনেছিলেন একটা ডিসক। কার গাওয়া মনে করতে পারে না এখন। তবে সেটা যে মাঝে মাঝেই শোনা হোত সেটা ভোলেনি। গানের কথাগুলো তো মনে গেঁথে গিয়েছিল। সুরও। কখনও কখনও মনে হয়েছে সুরবদ্ধ গানটা না শুনে যদি কথাগুলো পড়া যায় মনের ভিতরে কীরকম এক বোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেবজিতের বাবা বলতেন, 'এই গান সবসময় বা যখন তখন শোনার নয়। একটু প্রস্তুতি থাকা দরকার মানসিকভাবে।' অবশ্য দেবজিতের বাবা একথাও বলেছিলেন, 'ভালো লাগা গান যে যেমন ভাবে খুশি শুনতে পারে। কোনো বিধিনিয়ম থাকার দরকার নেই। শুনে যদি মন ভরে তাহলেই যথেষ্ট। সুর মনে কেউ তুলবে। কথাগুলো ভাবাবে। যে নিয়মিত শোনে না সেও একবার শোনার পর আরেকবার শুনতে চাইবে।'

গানটি রচনার পর পেরিয়ে গেছে অনেক বছর। একশো পাঁচ বছর। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ পৌষ তারিখটা মনে থাকে। ইংরেজি সাল মাসের হিসেবে ১৯১০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। তবে যতদূর জানা যায় গানটি প্রথম গাওয়া হয় কদিন বাদে। জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি ভবনে গাওয়া হয়। শান্তিনিকেতনেও। গানটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা হলেও কোনোরকম গণ্ডীবদ্ধ রূপ নেয়নি। সূর্যকিরণ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেভাবেই গানটির সুর ও বাণী দোলা দেয়। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে না শুনলে গানের সমগ্র চেহারাটা স্পষ্ট হবে না। নির্দিষ্ট শব্দ বদলে অন্য শব্দ বসালে গানটির হয়তো অর্থহানি বা স্বরবিচ্যুতি ঘটত। যেসময় গানটি রচনা হয়েছে তখন গীতিকারের বয়স পঞ্চাশ ছোঁয়নি। আটচল্লিশ বছর। নোবেল পুরস্কার পাননি। অজস্র সৃজনকর্মের মধ্যে ভরে রয়েছে গান। কতবার কত অনুষ্ঠানে কতজন গানটি গেয়েছেন সে হিসেব পাওয়া কঠিন। দেবজিতের খুব পছন্দের গানের মধ্যে এটি রয়েছে। বাবা বলেছিলেন, 'যখন তখন গাইবে না। এ গানের মধ্যে দিয়ে প্রিয়জনকে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপার রয়েছে বলেই মনকে প্রস্তুত করতে হয়।' গানটির স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভীমরাও শাস্ত্রী।

দেবজিত বড়োদিনের সকালে গানটা প্রথমে পড়ল চারবার। স্পষ্ট উচ্চারণ। তারপর 'গীতবিতান' খুলল। পূজা পর্যায়ের ৫৫৭ নম্বর গান। স্বরবিতান-এর ৩৮ নম্বর খণ্ডে রয়েছে। গানটা গাইতে শুরু করল দেবজিত। বই বন্ধ রেখে। কোনো যন্ত্র নিলো না। খালি গলায় গাইবার সময় মনের পটে ভেসে উঠছিল পর পর শব্দগুলো। 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ/জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস! সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো/ পাগল ওগো ধরায় আস।' দেবজিত দুবার গাইবার পর পরের অংশে পৌঁছোল। 'এই অকূল সংসারে/ দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।/ ঘোর বিপদ-মাঝে/ কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো।' গান এগিয়ে চলল। দেবজিত চোখ বুজে গাইছে, 'তুমি কাহার সন্ধানে/ সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে/ এমন ব্যাকুল করে/ কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস!/' গানের শেষ অংশে পৌঁছে গেলো এরপর, 'তোমার ভাবনা কিছু নাই—/ কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।/ তুমি মরণ ভুলে/ কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।'

গানটা গাইছিল অনেকক্ষণ ধরে। চোখ খুলে একসময় দেখল সামনে অনেকে বসে আছে। ছেলে মেয়ে বউ ছাড়া দিদি জামাইবাবু ভাগ্নে মাসি পাশের ফ্ল্যাটের কয়েকজন। মাসি বলল, 'ঠিক আছে তুই আবার গা।' সকলেই মনে মনে চাইছিল সেটা। মেয়ে দেবাদৃতা বলল, 'বাবা আবার গাও। তুমি গাওয়ার পর আমি গাইবো।' অনেক গান ন'বছরের মেয়ের মুখস্থ। নির্ভুল সুরে তালে লয়ে গায়। দেবজিত মেয়ের দিকে তাকিয়ে আবার গাইল। চোখ ঘুরে গেলো কয়েকবার দেওয়ালে টাঙানো বাবা-মায়ের ছবির দিকেও। দেবজিত থামার পর সে আগ্রহে শুনতে চাইল মেয়ের গলায় গানটা। দেবাদৃতা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গাইতে শুরু করল। দেবজিতের ভাগ্নে পল্লব কিছুক্ষণ আগে থেকেই সবটা ধরে রাখছিল টেপরেকর্ডারে। দেবাদৃতা গাইছিল এক মনে, 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ/ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।' ঘরে কোনো শব্দ নেই। সকলে আবিষ্ট হয়ে শুনছিল। দেবজিতও। ■

তিনটি কথা আর তিনটি মোহর

রামনাথ অনেক বছর ধরে এক জমিদারের কাছে কাজ করে। জমিদার মানুষটি ভালো। নিয়ম মেনে রোজ কাজ করে। একদিন জমিদার বললেন তাকে, 'আমাদের বাড়িতে আজ একবার সময় করে যেও তো।' একটু থেমে বললেন, 'অবশ্যই যেও বাবা। গেলে তোমার মজুরি ছাড়া বাড়তি কিছু দিতে চাই।'

সেদিন কাজ একটু আগে শেষ করে জমিদারের বাড়িতে গেল। যাওয়ার পর একটুও দেরি না করে জমিদার বললেন, 'তুমি তো বাড়ি ফিরবে, বেশিক্ষণ আটকাবো না। তোমাকে উপহার দেওয়ার জন্যে দুটো জিনিস বেছে রেখেছি। প্রথমে আছে তিনটে সোনার মোহর। তারপর রয়েছে— তিনটে পরামর্শ।'

রামনাথ বলল, 'বাবুমশায়, আমার কাছে কিছু পয়সা তো আছে। সোনার মোহরের দরকার নেই। আপনি আমাকে তিনটে পরামর্শই দিন।'

জমিদার বললেন, 'তাহলে একটু মন দিয়ে শোন। প্রথম পরামর্শ হলো— যখনই তুমি পুরনোর বদলে নতুন রাস্তা বেছে নেবে তখনই তোমাকে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'খেয়াল রাখবে সবসময়, বেশি কথা বলবে না।' রামনাথ অপেক্ষা করছে তৃতীয় পরামর্শ শোনার জন্যে। জমিদার বললেন, 'কোনো কাজ করার আগে ভুল করছো কিনা একবার ভেবে নেবে।'

এসব কথার পর জমিদার একটা মোটা রুটি রামনাথকে দিয়ে বললেন, 'যখনই মন খুশিতে ভরা থাকবে এই রুটি একটু ভেঙে নেবে।'

এবার সে জমিদারকে প্রণাম করে বাড়ি ফেরার পথ ধরল। চলতে চলতে একজনের সঙ্গে দেখা। অচেনা পথিক। সে রামনাথকে বলল, 'আমরা ছোট রাস্তা দিয়ে গেলে কম সময় লাগবে।' রামনাথ বলল, 'না ভাই। আমি এই রাস্তা ধরেই যাবো।' রামনাথ এগোল। খানিকটা যাওয়ার পর সে একটা চেঁচামিচির শব্দ শুনতে পেলো। বুঝতে পারল, 'সেই লোকটা ছোট রাস্তা ধরে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে পড়েছে!'

রামনাথের খিদে পেয়েছিল। সে এক সরাইখানায় খাওয়া আর একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে গেল। রাস্তার ধারেই। খাবার চাইতে তা দিল। রামনাথ দেখল তাকে যে মাংস দিয়েছে তা অন্যরকম। কিসের মাংস কে জানে! জমিদারের দ্বিতীয় পরামর্শ মনে পড়ে গেল। সে চুপচাপ খাবারের দাম চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। তখন সরাইখানার মালিক বলল, 'শোন, যখনই কেউ খাবারের মধ্যে অন্য কিছু বের করে আমরা তাকে বেদম মারি। একেবারে মেরে ফেলে তার মাংস রান্না করে বেচে দিই।' রামনাথ কথাগুলো শুনল। কোনো জবাব দিলো না।

সন্ধের আগে সে বাড়ি পৌঁছে গেল। দেখতে পেলো, ঘরের মধ্যে তার বউ এক যুবকের সঙ্গে কথা বলছে খুব হাসিখুশিতে। ভীষণ রাগ হলো রামনাথের। বাইরে পড়ে থাকা একটা লাঠি তুলে নিলো ছোকরাটার মাথা ফাটাবে বলে। ঠিক সেই সময়ে মনে পড়ল জমিদারের তৃতীয় পরামর্শ। সে বউয়ের কাছে গেল। বউ তো আরও খুশিতে উছলে পড়ল। ছোকরাকে বলল, 'ওরে দীপঙ্কর! এই তোর বাবা এসে গেছে।' রামনাথের আনন্দের সীমা রইল না।

সে ভাবল যদি সে জমিদারের কাছ থেকে তিনটে পরামর্শ না শিখত তাহলে আজ কি হোত...?

তখনই মনে পড়ল জমিদারের দেওয়া রুটির কথা। 'খুশির সময় ভাঙবে, সত্যিকারের খুশির সময়'--- একথা বলেছিলেন। রুটি ভাঙতেই তার মধ্যে থেকে তিনটে সোনার মোহর বেরোল। রামনাথ বুঝতে পারল ওগুলো রুটির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন দয়ালু মালিক।

হিন্দি থেকে অনুবাদ : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বইয়ের টানে

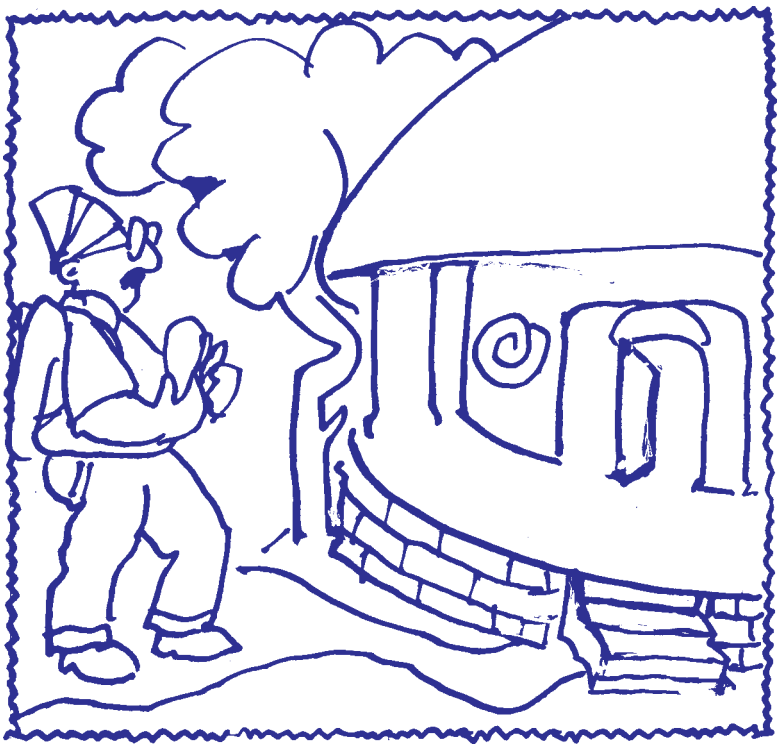

প্রশ্নবাণ

১. 'দুর্গেশনন্দিনী' কার লেখা? কবে প্রকাশিত?
২. 'বন্দেমাতরম্' গানটি কোন্ লেখার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়? গীতিকার আর কি কোন গান লিখেছিলেন?
৩. যথাযথ পারিশ্রমিক না দিয়ে যে অন্যদের খাটিয়ে নেয় সে কোন্ ধরনের মানুষ? কি বলা হয় তাকে—জনমিত্র, না জনশত্রু?
৪. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম? কোথায় থাকতেন তিনি?
৫. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?

ফিরে পড়া

বঙ্গভূমির প্রতি

মধুসূদন দত্ত

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনাদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে নাহি খেদ তাহে
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন—
কিন্তু কোন গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা, কহো গো শ্যামা জন্মদে?
তবে যদি দয়া কর ভুল দোষ, গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

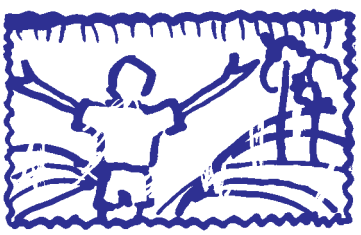
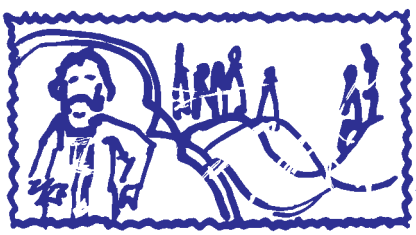

নেশায় আসক্ত হচ্ছে মেয়েরাও

লক্ষ্মী দাস

ভারতীয় নারীর জীবন অন্যদের থেকে অনেক আদর্শ ও প্রেরণাদায়ী। আজ অসংখ্য মহিলা শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা নির্বিশেষে নিজের বুদ্ধি, মমতা, করুণা ও পরিশ্রমের দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে চলেছেন। আজও ভারতের নারীসমাজ সুসংস্কারের জন্য পৃথিবীর কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে আছে। এর কারণ হলো, ভারতের মেয়েরা জীবনের মূল্যবোধকে তাদের পরিবারে অতি সহজেই স্থাপিত করে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। যদি বলা হয় ভারতের মহানতার পিছনে নারীজাতির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তাহলে ভুল হবে না। আজ যেভাবে পৃথিবীতে নেশার বাড়বাড়ন্ত চলছে, তার প্রভাব থেকে ভারতও মুক্ত নয়। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা যেভাবে মদ, সিগারেট, বিড়ি, তামাকু, ড্রাগস্ ইত্যাদির দিকে ঝুঁকছে তা বেশ চিন্তাজনক। হাজার হাজার টাকা বেতনের চাকরি করা যুবক-যুবতী থেকে বেকার, হতাশাগ্রস্ত এবং ফুর্তিতে দিন কাটানো অসংখ্য যুবক-যুবতী নেশার শিকার হয়ে জীবন নষ্ট করে ফেলছে। নেশায় আসক্তদের পরিবার-পরিজন আজ আতঙ্কিত, বিশেষ করে মায়েরা। সব মা-ই তার মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্রের খোঁজ করে। তার প্রথম মাপকাঠি হলো পাত্র যেন কোনোরকম নেশায় আসক্ত না হয়। যুবতীরাও আশা করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী যেন নেশামুক্ত হয়।

আমরা সবাই জানি যে, ধূমপান, মদ্যপান, গুটখা এবং তামাকু সেবন আমাদের কত ক্ষতিকারক। কিন্তু কতজন সেটা মনে রাখে, কতজন সেটা ছাড়ার জন্য চেষ্টা করে! মানুষ হলো অভ্যেসের দাস, ইচ্ছে করলেই এসব ছাড়তে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য যদি এধরনের কোনো নেশা করে থাকেন সেসব পরিবারে এই নেশার জন্য নানারকম অশান্তি, মনোমালিন্য এমনকী নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে অকালে এই পৃথিবী ছেড়ে চলেও যেতে হয়। এর ফলে ওই পরিবারটিকে অথৈ জলে ভাসতে হয়। নানারকম লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারে নেশা করাটা একটা সৌখিনতা, তাদের নেশা করাটা হয়তো বাইরের কেউ জানতে পারে না, কিন্তু শরীরের যা ক্ষতি হওয়ার তা কিন্তু হয়ে যায়। নিম্নবিত্ত পরিবারে সেটা খুব-ই নিন্দনীয়, কারণ তারা যে মানের নেশা করে তা অত্যন্ত নিম্নমানের হয়। আর তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মানও অনুন্নত। ফলে সবাই জানতে পারে। আজকাল মেয়েরাও পিছিয়ে নেই, স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও কত অল্পবয়সে সমানে নেশা করছে। বাবা-মা কত কষ্ট করে তাদের পড়াশুনার জন্য ভালো স্কুল-কলেজে পাঠাচ্ছেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু তারা সেসব উপেক্ষা করে ঠিকভাবে পড়াশোনা না করে নেশা করছে। শুধু তাই নয় যেসব ছাত্রী নেশা করে না, তাদের নানারকম টিপ্পনী করছে। তাদের নিজেদের দলে টেনে আনছে।

নেশাগ্রস্ত যেসব পরিবারে শিশু থাকে তারা ওইসব মদ, সিগারেট, গুটখা খেতে দেখে নানারকম প্রশ্ন করে। ওই শিশুমনে নানা কৌতূহল জাগে। আমরা পারি না তাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে। অবশেষে তাদেরকে ধমক দিই অথবা মারধোর করি। কিন্তু কি দোষ তাদের? আমরা নেশার জিনিস বাড়িতে রাখব, নেশা করব আর শিশুরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেই দোষ? এর ফলে ওই সব বাড়িতে শিশুরাও আর ভালো থাকতে পারে না। কারণ দিনের পর দিন দেখতে দেখতে তারাও অকালে ওই নেশার মতো সর্বনাশার আশ্রয় নেয়। যেহেতু শিশুরা বড়দের অনুসরণ করেই বড় হয়। এইভাবে একটা গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

একদিকে বাবা-মা তাঁদের ছেলে-মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণী আধুনিকতার নামে নেশাকে জীবনের অঙ্গ করে চলেছে। এই নেশা এখন শহর, গ্রাম, গলি, পাড়া, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, উৎসব সবকিছুর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। নেশা শুধু যুবকরা নয়, যুবতীরাও ব্যাপকভাবে নেশা করতে শুরু করেছে। এটা আজ প্রতিটি পিতামাতাকে চিন্তায় ফেলেছে। 'ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি স্মোকিং ডে'র ওপর এক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ শতাংশ ছাত্রী স্মোকার। এরা প্রতিদিন ১৪টি সিগারেট খায়। নামীদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৮৭ শতাংশ ছাত্রী কেবল ফুর্তির জন্য সিগারেট ধরেছে। হাই সোসাইটির মহিলারা সিগারেট খাওয়াকে স্টাইল মনে করছে। মহিলাদের দ্রুত নেশায় আসক্ত হওয়ার প্রবণতাকে সমাজবিজ্ঞানীরা খুব বিপদের বলে মনে করছেন। তাঁরা ভয় করছেন সদ্যোজাত শিশুর রক্তে নিকোটিনের মতো বিষ পাওয়া যাবে না তো? ভারতীয় সমাজজীবনের মেরুদণ্ড নারীজাতি। পরিবারে ছোটদের শিশুকাল থেকে সংস্কারিত করতে পারেন মায়েরা। প্রধানমন্ত্রী নেশামুক্ত দেশ গড়ার ডাক দিয়েছেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মায়েদেরই এগিয়ে আসা দরকার প্রথমে পরিবারকে নেশা মুক্ত করার জন্য। কোনো এক দার্শনিক বলেছিলেন, 'Womens are Mother of Nation'। ■

দয়া করে শুনুন—কেননা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শ্রুতিগোচর ও চিরস্থায়ী

অতিথি কলম

এম. জে. আকবর

ভারতীয় উপমহাদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিতর্কের মাথাচাড়া দেওয়া বরাবরের মতই নজরে আসছে। অবশ্য এর তীব্রতা বা ধার কিছুটা কম হলেও এমন একটা ক্ষেপিয়ে তোলার কৌশলের বিরুদ্ধে যথাযথ উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নিশ্চিতভাবে আছে। সরাসরি বলছি, মহাত্মা গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন বলেই কি ভারত আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, নাকি ভারত চিরাচরিতভাবেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ছিল বলেই তার এক নাগরিক হিসেবে মহাত্মাও ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ?

এখন প্রশ্ন উঠবেই, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে আমরা কি বুঝি?

একটু পাশ্চাত্যের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে সেখানে দু'টি মত প্রচলিত— (১) ফরাসি বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের ওপর চার্চের নিয়ন্ত্রণ ছেঁটে ফেলা হলো এবং (২) কম্যুনিজম ধর্মকে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন থেকে মুছে ফেলার নিদান দিল। ব্যাপারটা দাঁড়াল, ফরাসি বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভলটেয়ার থেকে রুশ বিপ্লবের মার্ক্সীয় তত্ত্বের ফলিত প্রয়োগের অভিঘাতে দীর্ঘ সময় ইউরোপ থেকে চীন অবধি ধর্ম বলতে বোঝানো হলো একটা সম্পূর্ণ 'অযৌক্তিক' বস্তুকে। এর তাৎপর্য কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা বলয় ছাড়িয়ে এক গভীর অর্থ বহন করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বার্তাবাহক। ভারত কখনই ধর্মকে বাদ তো দেয়ইনি, শুধু তাই নয় ভারতীয় জীবন প্রণালীতে ধর্মকে অস্বীকারও করেনি। ভারত-সভ্যতার আদি থেকেই তারা সর্ব ধর্মের সমান অধিকারের কথা স্বীকার করে নিয়েছে তা সে ধর্মের অনুরাগীর সংখ্যা কমই হোক বা বেশি। এই প্রসঙ্গেই আজ যে দল শাসন ক্ষমতায় আছে বা সময়ের আবর্তনে কাল যে দল ক্ষমতায় আসতে পারে দেশবাসীর ধর্মাচরণ কখনই তার অনুযায়ী নয়। কেননা মনে রাখা দরকার, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা আইনি ধ্যান ধারণা, পরিধির অনেক ঊর্ধ্বে। আমাদের দেশে ধর্ম একটি মৌলিক সামাজিক অধিকার। যা চোখে পড়ে শুধু নয়, শ্রবণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না থাকলে পরিষ্কার শোনাও যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— আপনি যদি লন্ডন বা ওয়াশিংটন-এ বসবাসকারী একজন মুসলমান হন সেক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে আপনি আপনার মনমতো মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করতে পারবেন। কিন্তু প্রার্থনা করতে আসার জন্য কোনো ডাক আপনি সে দেশে শুনতে পাবেন না। কিন্তু এই ভারতে? নতুন প্রত্যুষটির আবাহন হবে বাতাসে ভাসমান আজানের ধ্বনিতে, প্রায় একই সঙ্গে গুঞ্জিত হবে মন্দিরগুলির ঘণ্টাধ্বনির সুর মূর্চ্ছনা। হ্যাঁ, এরই সমান্তরালভাবে শোনা যাবে গুরুদ্বার থেকে গুরু গ্রন্থ সাহেবের পুণ্য উচ্চারণ, পিছিয়ে থাকবে না গির্জাগুলির সুললিত ঘণ্টাধ্বনি।

স্বামী বিবেকানন্দ যিনি মহাত্মা গান্ধীর থেকে মাত্র ছ' বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁরা দু'জনেই ভারতের চিরকালীন অধ্যাত্মচিন্তাকে সুচিন্তিতভাবে লালন করে এক সুনীতিনির্ভর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপায়িত করার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। বিবেকানন্দ বলতেন সূর্যের রোদ হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, বৌদ্ধ সকলের ওপরই সমানভাবে পড়ে। কেউই একে অপরের থেকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। তাঁর বক্তব্যটি ছিল জলের মতো স্বচ্ছ— একে অপরকে সাহায্য কর, লড়াই নয়। শান্তির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও বিরোধিতার জন্য নয়। তাঁর অমোঘ বাণী যদি তুমি জন্মসূত্রে হিন্দু হও তবে সর্বদা চেষ্টা কর একজন ভাল হিন্দু হতে। যদি তুমি মুসলমান হয়ে জন্মাও সব সময় চেষ্টা কর একজন ভাল মুসলমান হতে। কেননা উভয়েই যদি তাদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর সৎভাবে আস্থাবান থাকে তাহলে তারা অনায়াসেই ভাল ভারতীয় হয়ে উঠবে। এই ব্যক্তিগত নীতিনিষ্ঠতা থেকেই জেগে উঠবে এক শক্তিমান ভারতবর্ষ। গৃহ-অভ্যন্তর থেকেই নির্মাণ হবে এক মহান জাতির। তিনি বলেছিলেন হিন্দু ধর্ম যা মূলত এক বৈদান্তিক জীবন প্রণালী তাকে কুসংস্কার ও কুআচারের পঙ্কিলতা থেকে টেনে তুলতে হবে। যারা বাল্যবিবাহ বা অস্পৃশ্যতাকে প্রশ্রয় দিত তাদের উদ্দেশে তীব্র ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছিলেন এরা আসলে ধর্মের নামে 'অমৃত' বিতরণের বদলে আসলে নালার জল বিতরণ করছে।

অন্যদিকে, গান্ধী তাঁর স্বাধীনতার মহাঅন্বেষণ শুরু করলেন এক চিরস্মরণীয় বাক্যের মাধ্যমে "Politics without religion is immoral" ধর্মহীন রাজনীতি-চর্চা অনৈতিক কাজ। তাঁর এই ঘোষণা তৎকালীন মুসলমান নেতৃত্ব যাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্যে ব্যবহারযোগ্য বস্তু বলে মনে করতেন তাঁদের সঙ্গে প্রায় মাপে মাপে মিশে গেল। অথচ আদতে গান্ধীর বক্তব্যের সঙ্গে প্রকৃত মিল ছিল ভারতীয় সুফি মুসলমান সম্প্রদায়ের। সুফি সম্প্রদায় সর্বদা মুসলমানদের স্মরণ করাতেন কোরানের পবিত্র নির্দেশের কথা যেখানে বলা আছে (Verse ২ : ২৫৬) কখনও অন্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ওপর কোনো প্রকার জোরজবরদস্তি চলবে না। মুসলমানরা যেন নবীর নির্দেশিত বহুত্ববাদ ও অপরকে গ্রহণ করার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়। প্রসঙ্গত এটিই ছিল ১৩ শ' খৃস্টাব্দের প্রসিদ্ধ ইসলামিক পণ্ডিত ইবন অল আরবীর চেতাবনী। তিনি মুসলমানদের স্বধর্মের আচার পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরধর্মের নিন্দা করার বিষয়ে কড়া নিষেধ করে গিয়েছিলেন।

মজার কথা মহাত্মা গান্ধী যখন দেশে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথাকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান অস্ত্র হিসেবে বেছে নিলেন তখন কিন্তু তিনি মোটেই দেশের কোনো

একটি নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস অনুসারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বোঝাননি। মুসলিম লীগ এই সময় মানুষকে বোঝান রামরাজ্য অর্থে হিন্দু আধিপত্যবাদ। এর একটিই কারণ, লীগ তখন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীর স্বপ্নে ছিল ভালবাসার আদর্শ। লীগ প্রচার করল ঘৃণার তত্ত্ব। দাবি করল ইসলাম সব ধর্মের ওপরে। এর প্রভাবে ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস বিষ-জারিত হয়ে গেল। টুকরো হয়ে গেল দেশের ভূগোল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল নাস্তিক জিন্নার জন্যে। তৎকালীন ইউরোপের চলতি সংস্কৃতির অনুগামী হয়ে জিন্নার কোনো ধর্মেই কোনো আস্থা ছিল না। তিনি না করতেন ইসলামকে শ্রদ্ধা, না বুঝতেন গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন। তার ফলে তিনি কত সহজে ইসলামের তত্ত্বকে দুমড়ে দিয়ে আধিপত্যবাদের ভিত্তিতে দেশ ভাগের প্রধান মদতদাতা হলেন।

দেশভাগ হয়ে গেল। জিন্না পাকিস্তানে চলে গেলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরেও দলের মধ্যে যে আবার একটা জিন্না জন্ম নেবে না এই ভয় কখনই কংগ্রেসকে ছাড়ল না। এরই ফলে আমাদের দেশে সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমদৃষ্টির ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় এল দ্বৈতবাদ (যাকে অনায়াসেই দ্বিচারিতা বা তোষণ বলা যাবে)। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যাবে সেই ১৯৫০ সালে চালু হওয়া স্ত্রী/পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য এক আইনি সংস্কার যা Gender Reform নামে খ্যাত। লক্ষণীয় আইনটি মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য হলো না। এই সময় ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ Manchester Guardian পত্রিকার পক্ষ থেকে নেহেরুকে মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন আইনের সঙ্গত প্রসঙ্গ তোলায় কৌশলী নেহরু বলেছিলেন মুসলমানদের জন্য এইসব সংস্কার করার সঠিক সময় এখনও আসেনি। অবশ্যই তাঁর কথার মধ্যে যে প্রগাঢ় শঠতা ছিল তা দীর্ঘ ৩০ বছর পরে ১৯৮০ সালে শাহবানু মামলায় আবার প্রমাণিত হয়েছিল। একটি তালাকপ্রাপ্ত হতভাগ্য নারীকে সুপ্রিম কোর্ট যখন সামান্য খোরপোষ দেওয়ার আদেশ দিল তখন দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও নিশ্চিত বুঝেছিলেন এ অধিকার মুসলমান নারীর পাওয়া নয়। অবলীলায় সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ নাকচ করে দিয়েছিলেন। শোরগোল পড়েছিল দেশে। হতমান হয়েছিল আদালত। তবুও এই কূপমণ্ডুকতার আবর্ত পেরিয়ে ধীরে হলেও দেশে এসেছে বদল। তা হয়তো অনেক সময় এখানে ওখানে এটা-ওটার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। কোনো রাষ্ট্র বিপ্লব করে নয়। আসলে ভারতের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা আর আধুনিকতাকে আত্মীকরণের যে মজ্জাগত প্রবণতা রয়েছে তা অবরুদ্ধতা বা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে কখনই মাথা চাড়া দিতে দেয়নি। গান্ধী দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই এক বরেণ্য ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, শুধুমাত্র কম্যুনিস্টরা ছাড়া। কেননা তিনি (গান্ধী) বিশ্বাস করতেন ভারতের অতীত সভ্যতার গভীর শিকড় ধরেই এগোবে ভবিষ্যতের ভারত। ভারতে আজও তাঁর উত্তরাধিকার প্রাসঙ্গিক ও প্রবহমান, কিন্তু জিন্নার বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনার ফলশ্রুতিতে সবই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এক চরম অরাজকতা সেই দেশগুলিতে বিরাজমান।

মানতেই হবে বিভাজনের আদর্শের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিত্য নতুন বিভাজনের ক্ষেত্র আবিষ্কার করা। এর পরিণতিই হচ্ছে গৃহযুদ্ধের বাতাবরণে জনগোষ্ঠীকে বিপন্ন করে তোলা। ইংরেজিতে যাকে বলে Macro বা Micro বিশাল বা ক্ষুদ্র যে কোনো যত্নে নির্মিত ধাঁচাকে (structure) ভেঙে তছনছ করে দেওয়া। এক কথায় এক চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করা। অন্যদিকে বহুদর্শিতার আদর্শ একসঙ্গে চলার ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে সমৃদ্ধি করায়ত্ত করা অনেক সহজ। ■

লাক্সারী ট্যুরিষ্ট লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণ করুন

সুন্দরবন ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো : মৃগাঙ্ক রায় (বাপী)

মোবাইল : 9734206040 / 9800684201

অফিস : ক্যানিং রেলওয়ে মার্কেট

ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে

ইমেল : banbhoomitravels@gmail.com

জম্মু কাশ্মীরের ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীর নির্বাচনের ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হলো, নানান রাজনৈতিক অভিধায় এই ফলাফলকে চিহ্নিত করা যায় সে আলোচনা করার অবকাশও রয়েছে। তবে প্রথমেই যেটা স্বীকার করে নিতে হবে তা হলো আর পাঁচটা গড়পড়তা রাজ্যের ৫ বছর সালিয়ানা (এখানে ৬ বছর অন্তর) ভোটের লড়াই এটি নয়। যুগব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, বন্দুকের নলের মুখে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের নিরন্তর চেষ্টা। ধারবাহিকভাবে গোটা উপত্যকা ব্যাপী পাকিস্তানি প্ররোচনায় অনুপ্রবেশের মোকাবিলায় প্রায় ভেঙে পড়া রাজ্য প্রশাসন ও নানান নামের নির্বাচন বয়কট করার জিগির তোলা দলের চোখ রাঙানির মুখে যে বিপুল হারে জম্মু বিশেষ করে কাশ্মীরের ভোট যন্ত্রগুলি ভরে উঠেছে তা ঈর্ষাকাতর পড়শি পাকিস্তানকে যে হতবাক করে দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই অর্থে এই নির্বাচন ছিল ভারতীয় রাষ্ট্র ও তার বিশাল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আধারে জম্মু- কাশ্মীর যে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা সরাসরি প্রমাণ করার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা।

সব ধরনের হুমকি-ধমকি প্রাণভয় উপেক্ষা করে এই রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ গণতন্ত্রের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। শূন্য হিমাঙ্কের ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে অনেক জায়গায় ভোট পড়েছে ৭৬ শতাংশ। ভারতীয় গণতন্ত্রের অংশীদার হয়ে থাকার এই বেনজির উদাহরণ হয়ত সেই তাঁবাদি হয়ে যাওয়া কাশ্মীরে 'গণভোটে'র দাবিকে চিরতরে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই নির্বাচন সর্বাংশেই তাই গুণগতভাবে ঐতিহাসিক।

রাজনৈতিক মানদণ্ডগুলির সূচকে এই নির্বাচনকে যদি এক কথায় চিহ্নিত করতে হয় তা হবে জম্মু-কাশ্মীর রাজনীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ। মানতেই হবে বিজেপি-র সমস্ত আসন এসেছে জম্মু থেকে। কিন্তু সেখানে গত নির্বাচনের ১১ থেকে ২৫-এ পৌঁছনো তো সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, উপত্যকায় বিজেপি ইতিপূর্বে অধিকাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি, এবারে কিন্তু কাশ্মীরে ৪০টি আসনের মধ্যে ২৬ টিতে মুসলমান প্রার্থী খাড়া করেছিল। এর মধ্যে লড়াইয়ে ছিলেন ৩ জন মহিলা। রাজনীতিতে রাতারাতি চমক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দল নিজেকে সংহত করেছে। উপত্যকায় ২.২ শতাংশ ভোট পেয়েছে, গতবারের চেয়ে ১ শতাংশ বেশি। ওদিকে জম্মুতে বিজেপি টিকিটে প্রথম মুসলমান প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এগুলি তো কেবল সংখ্যার হিসেব। আসলে ভেঙে গেছে যুগব্যাপী লালিত বহু মিথ। স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীর ছিল বাকি দেশবাসীর কাছে শুধু ভ্রমণ ছাড়া প্রায় এক নিষিদ্ধ রাজ্য। এখানকার বহু কালাকানুন এখনও বহাল তবিয়তে বলবৎ আছে। তার আলোচনা বহুবার হয়েছে, হবে। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরের দিনগুলির সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেলগুলিতে আশ্চর্য সব হেড লাইন দেখা যাচ্ছে— "Some in PDP keen on BJP tie up" অর্থাৎ (হালকা ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহমর্মী) এই দলের অনেকেই চির অচ্ছুৎ বিজেপি-র হাত ধরতে উন্মুখ। ব্যাপারটা ভাবুন। আবার ওমর আবদুল্লার এন সি পা বাড়িয়েই রয়েছে। মুখে খেলাচ্ছে। ২৩ শতাংশ অর্থাৎ সব দলের থেকে বেশি ভোট পেয়ে বিজেপি-র প্রথম স্থান দখল করা এক কথায় অভূতপূর্ণ। এর সিংহভাগ অংশ যতই হিন্দুপ্রধান জম্মু অঞ্চল থেকে আসুক না কেন জম্মুতেও তো পিডিপি, এনসি,কংগ্রেস সবাই ভোট পেয়েছে, আসনও জিতেছে। ৩৭-এর মধ্যে বিজেপি ২৫টি পেয়েছে। কিন্তু তার সরাসরি ভোট প্রাপ্তির হিসেবে প্রথম স্থানে গিয়ে চালকের আসনে বসা আক্ষরিক অর্থেই ছিল উপত্যকার সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় লালিত এনসি, পিডিপি, কংগ্রেস প্রভৃতি দলগুলির কাছে অকল্পনীয়। হতভম্ব কংগ্রেস বিজেপি-কে আটকাতে পিডিপি-র দিকে সমর্থন না চাইতেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, কাশ্মীরে দলত্যাগ-বিরোধী আইন প্রযোজ্য নয় বলে নানান ছুটছাট দল ও নির্দল বিজয়ীরা টু-পাইস করে নিত। তাদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। ভোট কমেছে ২০০৮-এ পাওয়া ৩২ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে। সমীক্ষকরা জানাচ্ছেন, ভোটদাতাদের মাত্র ৪ শতাংশ তথাকথিত

আজাদি বা ধারা ৩৭০ বা মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। এই নির্বাচনে তাঁরা পাখির চোখ করেন নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া সুশাসন ও ফলদায়ী পরিকল্পনাগুলির সাফল্যকে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে জেহাদি কার্যকলাপে নাজেহাল কাশ্মীরিদের মাত্র ১ শতাংশ

জম্মু ও কাশ্মীর নির্বাচনী চালচিত্র :২০১৪		
মোট আসন : ৮৮		
দল	২০১৪	২০০৮
পিডিপি	২৮ (২২.৭%)	২১
বিজেপি	২৫ (২৩%)	১১
এন সি	১৫ (২০.৮%)	২৮
কংগ্রেস	১২ (১৮%)	১৭
অন্য	৭—	১০

- জম্মু-কাশ্মীরের বিধান সভার মেয়াদ ৬ বছর
- প্রাপ্ত ভোট শতাংশের হারে (%)

পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোজনের দাবির পক্ষে মত দিয়েছিলেন। স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মাত্র ২ জন। তবে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে এখনও দুস্তর বাধা রয়েছে। প্রতি চারজনে তিনজনই বলছে তারা কাশ্মীরি, বাকিরা কাশ্মীরি ও ভারতীয়। একমাত্র উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানই এই সব ধোঁয়াশা কাটাতে পারবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

তবে এই ফলাফলে উপত্যকায় ৪০টি আসন (লাদাখ ৪) ও জম্মুর ৩৭টি আসনের তুল্যমূল্য সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও জম্মুবাসীরা এযাবৎ যে বৈষম্যমূলক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই হতাশা কাটবে। ২৫টি আসনে বিজেপি-কে জিতিয়ে তাঁরা আজ ন্যায় বিচার প্রত্যাশী। খবর অনুযায়ী পিডিপি বিজেপি হোক বা বিজেপি-এনসিপি— উভয় ক্ষেত্রেই দু'টি অঞ্চলই যে উন্নয়ন ও সরকারি কোষাগারের ন্যায্য পাওনা পাবে সেটা নিশ্চিত। বিজেপি সভাপতি যেমন বলেছেন "বিজেপি সরকার গড়তে পারে, সরকারে থাকতে পারে, সরকারকে সমর্থনও দিতে পারে"। এই তিনটি সম্ভাবনাই প্রবল। কোনো দুরভিসন্ধিপূর্ণ কৌশলে দলকে ক্ষমতার বাইরে রাখলে তার ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। কেননা জম্মুর এক বিশাল সংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্বকারীদের অস্বীকার করার অনৈতিক হিম্মত জোগানো সহজ নয়। জম্মু-কাশ্মীরে সরকার গঠন প্রথমে বলা আর পাঁচটা রাজ্যের মতো নয়। বিশ্বের বহু দেশই আমাদের ওপর তীব্র দৃষ্টি রাখছে। সেখানে নড়বড়ে সহজেই বাগে আনা যায় এমন কোনো সরকার হলে তাদের পক্ষে সুবিধেজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে চটজলদি সিদ্ধান্ত হঠকারী হতে পারে। তাই বিজেপি শিবিরের সেনাপতি অমিত শাহ পা মেপে ফেলার পক্ষপাতী। অবশ্য সাজ্জাদ লোনের ২ জন বিজয়ী-সহ আরও ৪ জন নির্দল বা অন্যান্যদের সমর্থন তারা ইতিমধ্যেই জোগাড় করেছে বলে খবর। তবে পিডিপি-র সঙ্গে জুনিয়র পার্টনার হিসেবে থাকার চেয়ে তুলনায় কমসংখ্যার ওমর-এর সঙ্গে হাত মেলানো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বলেই একটা অংশের অভিমত। সেক্ষেত্রে বিজেপি-র নিয়ন্ত্রণ থাকবে বেশি। তবে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি-র হাত ধরাই যে রাজ্যের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের সেরা দাওয়াই এমন একটা চাপ পিডিপি-র অভ্যন্তরেও বহমান। পিডিপি অধিকর্তা বলেছেন, অবশ্যই জম্মুর যথাযথ প্রতিফলন সরকারে থাকা উচিত। এখন নানান দোলাচল ও কূটকৌশলই ক'দিন উষ্ণ করবে হিমাঙ্কের নিচে থাকা ভূস্বর্গের রাজনৈতিক আবহ। তবে বিজেপি-র বন্ধনকে শিথিল করে এগোবার ক্ষমতা যে আজ সেখানকার রাজনীতিকদের নেই এই অবিশ্বাস্য সত্য মানা ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প নেই। ■

জাতিদাঙ্গায় আবার অগ্নিগর্ভ অসম

সারথি মিত্র।। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখন অসমে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে মৃতের সংখ্যা সরকারিভাবে ৯০ ছাড়িয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ২৩ ডিসেম্বর রাতে। ওইদিন অসমের কোকরাঝাড়, শোণিতপুর এবং ধুবড়ি জেলায় নৃশংস হামলা চালায় ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব্ বড়োল্যান্ড (সংবিজিত)। তারপরেও দু'একদিন নিয়মমাফিক হামলা চালিয়েছে এই জঙ্গিগোষ্ঠী। ঘটনার পরই কড়া অবস্থান নেয় কেন্দ্র। গত ২৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সেনাপ্রধান দলবীর সিং সুহাগের জরুরি বৈঠকের পরই সেনাবাহিনী 'অপারেশন অল-আউট' শুরু করে দেয়। এন ডি এফ বি সংবিজিত গোষ্ঠীও কিন্তু এই মুহূর্তে মরিয়া আক্রমণ চালাচ্ছে। সবমিলিয়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয় তা আশঙ্কায় রেখেছে অসমবাসীদের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাটিকে 'পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদ' বলে ব্যাখ্যা করে তদন্তভার এন আই এ-কে দেবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

সেনা-অভিযানে সঙ্গী সি আর পি, এস এস বি এবং অসম রাইফেলসের জওয়ানেরাও। মূলত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরাই ছিলেন জঙ্গিদের লক্ষ্য। তবে কিছু কোল, ভিল, মুণ্ডারাও রয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। এই ঘটনার দায় অসমের তরুণ গগৈ সরকার কোনোমতেই এড়াতে পারেন না। চিরকাল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে অসমকে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল কংগ্রেস। ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে চিরাং জেলায় দুই এন ডি এফ বি (সংবিজিত) জঙ্গির মৃত্যু হয়। তাপরই সংবিজিত বসুতামারির নেতৃত্বে ওই জঙ্গিগোষ্ঠী পাল্টা হামলার হুমকি দেয়। এই হুমকি মোতাবেকই পরিকল্পনামাফিক হামলা চালানো হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা সবই জানতেন। এমনকী ঘটনার আগে তাঁরা ফোনের মাধ্যমে এব্যাপারে নিম্নস্থ প্রশাসনিক কর্তাদের সতর্কও করেন, কিন্তু পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনো উদ্যোগ নেননি।

কেন্দ্রীয় বিদেশ-মন্ত্রক সূত্রে খবর দুই প্রতিবেশি দেশ ভুটান ও মায়ানমারও

শরণার্থী শিবিরে জাতি-দাঙ্গায় সন্ত্রস্ত ঘরছাড়া মানুষজন।

জঙ্গি-কার্যকলাপ রুখতে এক্ষেত্রে ভারতের পাশে দাঁড়ানোরই আশ্বাস দিয়েছে। ২০০৩ সালে আলফা, কে এল ও এবং এন ডি এফ বি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন অল ক্লিয়ার' অভিযানে নেমেছিল ভুটান সরকার। বর্তমানে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অপারেশনে যেতে এই দুই প্রতিবেশির দিকে স্বাভাবিক কারণেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ভারতকে। তবে ভারতের পক্ষ থেকেও চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। ভুটান ও মায়ানমার সীমান্তে নজরদারি চালাচ্ছে সেনা হেলিকপ্টার। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের ধরতে 'কোবরা' জওয়ানদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সেনাবাহিনী। জঙ্গিদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাগে আনবার জন্য এতদিন চেষ্টা করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু তাদের নরম মনোভাবের সুযোগ যে এরা নিচ্ছে তা বুঝে রীতিমত কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

অভিযানে নামার পর দেশের সেনাবাহিনী ভুটান ও অরুণাচল সীমান্ত লাগোয়া অসমের গ্রামগুলিকে নিজেদের বাগে আনতে চাইছে। দেশের কূটনৈতিক মহল এক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন চীনের ওপর। কারণ এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে চীন ঘোলাজলে মাছ ধরার একটা সুযোগ নেবেই। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দুই প্রতিবেশি ভুটান ও মায়ানমারের ওপর চীনের রাজনৈতিক প্রভাব কারুর অজানা নয়। অসমে জাতিদাঙ্গা নতুন কিছু নয়। ১৯৯৭ সালে নিম্ন অসমে বোড়ো ও সাঁওতালদের মধ্যে জাতি-সংঘর্ষে অন্তত হাজারখানেক মানুষ প্রাণ হারান। ঘর ছাড়া হয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ। এই ক্ষয়-ক্ষতি বেশিরভাগই হয় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেদের। এবারেও ভুক্তভোগী তারা। অসমের ত্রাণশিবিরগুলি

জঙ্গি আক্রমণে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি।

চর। তাদের যাবতীয় খবরাখবর এরা পুলিশের কাছে পৌঁছে দেয়। যে কারণে জঙ্গি দমন অভিযান চালায় পুলিশ। সেই আক্রোশেও এ ধরনের বর্বর হামলা হতে পারে বলে কোনো কোনো মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি যে দেশের সার্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উদ্বেগজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতেই অনুপ্রবেশকারী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই মুহূর্তে যথেষ্ট প্রভাবশালী। গত দশ বছরে আগের কেন্দ্র সরকারের এ ব্যাপারে ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতি ও নরম মনোভাবই দায়ী। এই মুহূর্তে কেন্দ্র জঙ্গি দমনে যথেষ্ট কড়া ও সদর্থক মনোভাব নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাদের পূর্বসূরীর ফেলে যাওয়া কৃতকর্মের ভাগীদারও হতে হচ্ছে। ■

আজও সেই সাক্ষী দিচ্ছে।

তবে এই ঘটনা যে পরিকল্পিত নানা সূত্র থেকে সেই ইঙ্গিত আসতে শুরু করেছে। ভুটানের সীমান্ত লাগোয়া এলাকার জনজাতিদের কোনোদিনই সুনজরে দেখেনি বিচ্ছিন্নবাদীরা। বোড়োল্যান্ড-পন্থীরা বরাবরই সন্দেহ করেছে যে এরা হলো পুলিশের

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

Sree Radhakrishna Store

Hosiery Manufacturers & Wholesellers

160, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Mob. 9433013838, Ph. (033) 2268-4840

অন্য রকম

মাতৃচ্ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সুনন্দা বৈশাম্পায়ন! ঘনবসতিপূর্ণ শহর বিলাসপুরের একটি অপরিচিত নাম। সরল সাদাসিধে এক প্রৌঢ়া মহিলা। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। সবসময়ই চশমা পরে থাকেন। তাঁর সারা জীবনটাই আনন্দে-বিষাদে ভরা। তাঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও যখন তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, শিশুরা তখনই বুঝতে পারে তাদের 'কাকু'-মা এসেছে। এটাই সুনন্দাজীর বিশেষত্ব। যদিও কোনো শিশুই তাঁর আত্মজ নয়, কিন্তু সব অনাথ শিশুই তাঁর মাতৃত্বের স্বাদ পায়।

সব শিশুর কাছেই তিনি 'কাকু'-মা। শহরের উপকণ্ঠে ঝাড়ভাট্টা এলাকায় সেবা ভারতীর কোষাধ্যক্ষ তেওয়ারি চাওলার বাড়িতে তাঁরা ভাড়া থাকেন। তাঁর স্বামী গত হয়েছেন। কেউ তাঁকে তাঁর নিঃসঙ্গতা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বরং উল্টে তাকেই জিজ্ঞেস করেন— ''নিঃসঙ্গতাটা আবার কি? আমার ২২টা ছেলেমেয়ে। আমার সঙ্গে এসো, দেখবে। আমি তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।'' এই বলে তিনি অনাথ আশ্রম 'মাতৃচ্ছায়া'-র দরজায় টোকা দিতেন। আর দরজা খোলার পর তাঁকে দেখেই হইহই করে শিশুরা সব তাঁর কাছে ছুটে আসতো। যদি কাউকে কখনও তিনি বকুনিও দিতেন, তার রেশ বেশিক্ষণ থাকতো না। আসলে মাতৃচ্ছায়াটাই ছিল তাঁর বাড়ি। গত সাতবছর ধরে তিনি এখানে আসছেন। তিনি বলেন, এখানে যদি কোনো কারণে ক'দিন আসতে

না পারি, তবে মনটা খুব ছটফট করে। এমনকী, রাতে আমার ভালো ঘুমও হয় না।

তিনি তাঁর সব শিশুর মুখেই হাসি দেখতে চান। তাই তিনি ঠিক করেছেন তাঁর লক্ষ টাকা দামের সম্পত্তি এই মাতৃচ্ছায়া-কেই দান করে যাবেন। তিনি মনে করেন, এতেই তাঁর সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে। তাঁর কথা— ''১৯৬২ সালে বেনারস থেকে বিলাসপুর স্বামীর সঙ্গে এসেছিলাম। আমরা সেবা ভারতীর কোষাধ্যক্ষের বাড়িতে ভাড়া নিয়েছিলাম। সেই সূত্রেই সেবা ভারতীর সংস্পর্শে আসি। সেটা ২০০০ সালের কথা। তারপর এই মাতৃচ্ছায়া প্রতিষ্ঠা হয়। অনাথ শিশুদের আশ্রয়স্থল এটা। আর এখনও সেটা বেশ ভালোভাবেই চলছে। আমি এই শিশুদের স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে রাখার চেষ্টা করি।'' কোনো শিশুর কান্না শুনলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও এই পরিণত বয়স ও বাতের ব্যথায় তা পেরে ওঠেন না। যখন পৌঁছান, শিশুটিকে কাছে টেনে নেন, শিশুটির কান্না থেমে যায়, মুখে ফুটে উঠে হাসি। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা
স্বস্তিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা
অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম
—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"এসো আমরা সরলতাময় পরিবেশে ফিরে যাই এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি। ফিরে যাই সৃষ্টির সেই অনাবরণ প্রকাশের মধ্যে, যাকে সৌন্দর্য বলা হত; ফিরে যাই সেই প্রাচীনকালের চিন্তার গভীরতায়, যা সংস্কৃতি বলে পরিচিত ছিল। সেই মেঝেতে মাদুর পেতে বসে উচ্চ চিন্তা করা! এসো, আমরা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করি, যাতে উপকরণের প্রয়োজন হয় না। এসো, আমরা মনেপ্রাণে যথার্থ জীবন গঠনের জন্য সচেষ্ট হই।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বিস্মৃতপ্রায় কথকদের অসাধারণ সৃষ্টির পরিচয়

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। যুগ যুগ বাংলার মানুষকে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ-সহ লোককাহিনি আনন্দ দিয়ে এসেছে এবং যাঁরা এই আনন্দদানের বাহক তাঁরা কথক নামে পরিচিত হয়ে সেদিনের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন শুধু করেননি ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেছিলেন। সেই হিসেবে এঁরা স্মরণীয়। কিন্তু বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য এঁদের নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করে গবেষক ড. নন্দলাল ভট্টাচার্য সমস্ত বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু এই কাজটি করা সহজ ছিল না। বাংলাদেশের সমগ্র কথক যাঁদের সম্বন্ধে খুব কমই জানি এবং অনেকেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন তাঁদের উদ্ধার করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। ড. ভট্টাচার্য যেমন এইসব কথকদের বংশধরদের বাসভবন থেকে এঁদের রচনা উদ্ধার করেছেন, তেমনি অনেক গ্রন্থাগার ঘুরে সংগ্রহ করেছেন। উল্লেখ্য, লেখক গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দুই বাংলার বিভিন্ন জেলার কথকদের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থটির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে তিনি মনে-প্রাণে গবেষক। এমন গ্রন্থ প্রকাশ না করলে আমরা কি জানতে পারতাম রামধন তর্করত্ন, শ্রীধর কথক, ধরণী কথক, কৃষ্ণকান্ত পাঠক, কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার, মুবহরানন্দ অবধূত প্রমুখ বিস্মৃতপ্রায় কথকদের অসাধারণ সৃষ্টির পরিচয়? গবেষক ড. ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন এই কথকেরা যেমন ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ। এঁরা কথকতার মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের কেবল আনন্দদান করতেন না, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আরও গভীর সমাজসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। একই সঙ্গে আনন্দদান ও জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্য তাঁদের নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। শ্রোতাদের কাছে তাঁদের কথকতা আকর্ষণীয় করার জন্য এঁরা সমস্ত রকমের শৈলী ব্যবহার করেছেন— হাস্যরস, করুণরস, নাট্যরস ইত্যাদি। বিষয় অনুসারে এদের রচনা কখনো গুরুগম্ভীর, কখনো লঘু-চপল। কখনো প্রকাশের মাধ্যম গদ্য, কখনো পদ্য, কখনো গান। মোটকথা, বৈচিত্র্যে পূর্ণ ছিল এঁদের সৃষ্টি। লেখক আর একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কথকতার অবদান উল্লেখযোগ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত মিশনারী ও পণ্ডিতদের বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে। লেখক দেখিয়েছেন বহু আগে থেকেই কথকেরা গদ্যশৈলী ব্যবহার করেছেন। এবং তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত মিশনারী ও পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য থেকে এতটুকু নিম্নমানের নয়। ড. ভট্টাচার্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন তা পাঠকদের কৌতূহল সৃষ্টি করে (দ্র. পৃ. ২১৬)। নন্দলাল ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার কথক ও কথকতা' সমস্ত অর্থে একটি আদর্শ গবেষণা গ্রন্থ। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবিষ্ট করেছেন যা গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এমন গ্রন্থ রচনার জন্য আমরা ড. ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই।

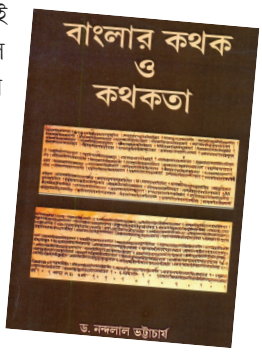

নন্দলাল ভট্টাচার্য : বাংলার কথক ও কথকতা। লিপিকা, কলকাতা। মূল্য : ২২৫ টাকা। পৃষ্ঠা : ২৮৪। প্রকাশকাল ২০১৪।

অনুচ্ছেদকে একেকটি অধ্যায়ের রূপ দেওয়া উচিত ছিল

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার হিন্দু সমাজের বিবেক। তাঁর বিভিন্ন রচনা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা এই কথা স্বীকার না করে পারবেন না। তাঁর সমস্ত রচনায় তিনি হিন্দুধর্ম কীভাবে সংকটের আবর্তে পড়েছে এবং এখনও সেই আবর্ত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে তার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। বর্তমান পুস্তিকার শিরোনাম 'জনচেতনা'— হিন্দুদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস। ছোট ছোট অনুচ্ছেদে তিনি এই প্রয়াস প্রয়োগ করেছেন। কয়েকটি অনুচ্ছেদ এই রকম : 'সংবিধানের ভূমিকায় ভারতবাসীর ভূমিকা অবদানের উল্লেখ নেই'। 'সংবিধানে ধর্মান্তরকরণের উল্লেখ নেই কেন?' প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। লেখক যদি ছোট ছোট অনুচ্ছেদগুলি বিস্তার করে ও আরো বিশাদ আলোচনা করতেন ভালো হোত। যেমন 'কংগ্রেস শাসকদের ছত্রছায়ায় হিন্দুশাস্ত্র বিকৃতি' শীর্ষক অনুচ্ছেদ (পৃ. ৭) ইরফান হাবিব মহাশয় কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিকৃত করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। ড. সরকার যদি একটি পুরো অধ্যায়ে এই একটি বিষয় নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করতেন তবে সেটি মূল্যবান হোত। আসল কথা তাঁর ২০/৩০ লাইনের একেকটি অনুচ্ছেদকে একেকটি অধ্যায়ের রূপ দেওয়া খুব উচিত ছিল। আমার কাছে এই মুহূর্তে Arun Shourie লিখিত Eminent Historians গ্রন্থ আছে। ৪০০ পৃষ্ঠার ২৩টি অধ্যায়ে লেখক কীভাবে ইরফান হাবিবের মতো বুদ্ধিজীবীরা ভারতের ইতিহাসে বিকৃত করছেন, কীভাবে ইসলামের দাপটে হিন্দু ভারত কোণঠাসা হচ্ছে তার বিবরণ দিয়েছেন। ড. সরকার যদি অন্তত ১৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন যাতে তাঁর বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হয় তাহলে তা আরো সমাদর পাবে। তাঁর এই পুস্তিকা খুবই পাণ্ডিত্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজনের হাতে হাতে ঘুরবে। কিন্তু একটি ১৫০/২০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ হলে তা লাইব্রেরিতে যেমন স্থান পাবে তেমনি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। ড. কৃষ্ণকান্ত সরকারকে এই বিষয়ে ভাবতে অনুরোধ করি।

জনচেতনা। ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার। প্রকাশক অজিত বিশ্বাস। পৃষ্ঠা : ১৬। মূল্য : ৮ টাকা।

কলকাতায় বনযোগী বালাসাহেব দেশপাণ্ডেজীর জন্মশতবর্ষ সমারোপ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী দশ কোটি বনবাসী সমাজ আমাদের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এদেশের উন্নতির জন্য তাই চাই বনবাসী সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা। পূর্বোত্তর সীমান্ত এলাকায় বনবাসী সমাজই রয়েছে। বিদেশি আক্রমণকারীকে প্রথম প্রতিহত করতে পারে এই সমাজ। চীনা আক্রমণের প্রথম সংবাদ এই সমাজের মানুষজনের কাছ থেকেই পেয়েছি। গত ২৮ ডিসেম্বর বিকেলে কলকাতায় কেশব ভবনের সভাঘরে বনযোগী বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মশতবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে একথা বলেন সংগঠনের উত্তরপূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ ভীড়ে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম। গত প্রায় ৬২ বৎসর ধরে বনবাসী সমাজকে স্বাভিমানী, স্বাবলম্বী ও সামর্থ্যবান করে গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় একতা ও অখণ্ডতাকে সুদৃঢ় করার কাজ করে চলেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। আর এই কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ হলেন বনযোগী বালাসাহেব দেশপাণ্ডে (২৬.১২.১৯১৩-২১.৪.১৯৯৫)। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল বলেন, হাজার বছর পর ভারতবর্ষের যে পট পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সূত্রে হতাশার বদলে যে ভরসার সৃষ্টি হয়েছে, তা কাজে লাগাতে হবে। বনবাসীদের দয়া নয়, সমব্যথী হয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্করলাল আগরওয়াল, প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বনাথ বিশ্বাস, সভাপতি অধ্যাপক রণজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করে।

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

পশ্চিম মেদিনীপুরের বহড়াকোঠা বি. বি. মাল্টিপারপাস স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো গত ২১ ডিসেম্বর। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে মোট ৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া অভিভাবকদের জন্যও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্থানীয় শিল্পীদের ছৌ-নৃত্য, যা উপস্থিত কয়েক'শো মানুষের মন জয় করে। জঙ্গলমহল অঞ্চলের এই স্কুল শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বারুইপুর বঙ্গীয় শিক্ষক সঙ্ঘের সম্মেলন

গত ২০ ডিসেম্বর (২০১৪) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন বারুইপুর 'সেবাভবন'-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বঙ্গপ্রদেশের শিক্ষক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি পঙ্কজ কুমার নিয়োগী শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে শিক্ষক সঙ্ঘের ভূমিকা এবং সংগঠনের অগ্রগতির কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ জেলার শিক্ষা সমস্যার উপরে প্রশ্ন রাখেন এবং সেগুলি আলোচিত হয়। প্রদেশের সংগঠন সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র পাল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা জগতের অবক্ষয় ও এর থেকে মুক্তির উপায়ের পথ নির্দেশ করেন। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে আগামী দুই বছরের জন্যে জেলার কাজ পরিচালনা করার প্রয়োজনে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি জগদানন্দ নস্কর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মঙ্গলনিধি

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পুরুলিয়ার জেলা স্তরের কার্যকর্তা অশোক মাহাত-র পুত্র সুমন মাহাত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা। গত ১৬ ডিসেম্বর, সুমন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্র কাজের জন্য মঙ্গলনিধি স্বরূপ ৫০০ টাকা দান করেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুহৃদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনাবসান হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর সকালে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৬ বৎসর। তিনি অকৃতদার ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। এই বছরেও তিনি শ্রীগুরু-দক্ষিণা সমর্পণ করে গিয়েছেন। সরল অনাড়ম্বর এই মানুষটি সকলের প্রিয় ছিলেন। সঙ্ঘের প্রাক্তন হাওড়া বিভাগ সঙ্ঘচালক সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি সহোদর।

ভিলাই স্টিল ক্লাব : পালাতে পারলে বাঁচি !

শেখর সেনগুপ্ত

মা বলতেন, তোর পায়ের তলায় সর্ষে। এই আছিস তো এই নেই। হরদম চরকিবাজি। জননীর কথা বেদবাক্য। দু'টো নেশার তাগিদে এ দুনিয়ায় আমার কথঞ্চিৎ মৌরসিপাট্টা। প্রথম নেশার খোঁচা খেয়ে যত্রতত্র উড়ান দেওয়া; আর দ্বিতীয় নেশার তাগিদে যা দেখলাম তাকে কলমের ডগায় নিয়ে আসা। গতি ও শব্দময় দুনিয়ায় এভাবেই অতীত হয়ে গেল সত্তরটি বসন্ত।

মাস আষ্টেক আগে ইস্পাত তৈরির আধুনিক প্রক্রিয়া দেখতে গিয়েছিলাম ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রধান শিল্পনগরী ভিলাইতে। হাওড়া থেকে রাত আটটা নাগাদ ছাড়ল মুম্বই মেল ভায়া নাগপুর। গতি প্রথমে ছিল মন্থর ও মৃদু। রাত বাড়লে গতি পৌঁছে যায় তুঙ্গে। পরদিন ঠিক বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পা রেখেছি দুর্গ স্টেশনের পরিচ্ছন্ন প্লাটফর্মে। সূর্যের খর তাপ। হয়তো লু বইছে। তা সত্ত্বেও স্টেশনে যে তিনজন আমার জন্য অপেক্ষমান, শিল্পশহরে তাঁদের গুরুত্ব ও পরিচিতি হেলাফেলার নয়। ওঁরা যেভাবে আমাকে সূচনাতেই আপ্যায়ণ করলেন, তাতে মনে মনে গর্বিত হলেও দু' মুহূর্ত আমি সামান্য বিব্রত হবার ভঙ্গিমা করি।

দুর্গ স্টেশন থেকে ভিলাই শহরের হৃদপিণ্ড রিশালি— দূরত্ব মেরেকেটে হয়তো তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার। গাড়ি ছুটছে আর আমি দেখছি বিজেপি-শাসিত এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের এক খণ্ডচিত্র। স্বস্থানে উন্নয়নের নামে প্রচুর ছেঁদো বচন ও ছেলেখেলা দর্শনে অভ্যস্ত আমি দেখছি তাপদগ্ধ শহরের ঝাঁ চকচকে কালো সর্পিল পথ, বিশাল উড়ালপুল, সেক্টর ওয়াইজ একটার পর একটা জমজমাট মার্কেট, শান্ত সমাহিত স্কুল-কলেজ, সবুজ ফাঁকা ময়দান, সযত্ন লালিত গাছপালা, স্বল্প বারিপাত সত্ত্বেও অতিকায় জলাশয়ে স্বচ্ছ জলের সংরক্ষণ; ভারতের বৃহত্তম স্টিল ফ্যাক্টরির অনর্গল নির্গত কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীও শহরের গায়ে মালিন্যের চাদর পরাতে পারেনি। আমার সঙ্কোপন লজ্জা। এখানে কী সেই ধরনের মাতব্বরদের অভাব ঘটেছে, যাদের পুজোয় মন নেই কিন্তু নজরটি রয়েছে নৈবিদ্যির দিকে? ভিলাইতে বাঙালির সংখ্যা বিস্তর। বেশিরভাগ স্টিল প্ল্যান্টে কর্মরত। তাঁদের একটা বড় অংশ চাকরি জীবনের শেষ পর্বে এসে সিদ্ধান্ত নেন, এ শহর ছেড়ে তাঁরা কোথাও যাবেন না। এখানেই তাঁদের অর্থ ও প্রতিষ্ঠা— যা অতঃপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে পুরুষাণুক্রমে। অনেকে জমি-জায়গা কিনে বাড়ি করলেন। অনেকে কিনেছেন ফ্ল্যাট। তবে বাঙালিসুলভ মনোভাব ও কৃষ্টি বদলায়নি। এর সমচেয়ে বড় নজির শহরে জমকালো দু-দু'টো কালীমন্দিরের নির্মাণ। উৎসবে পার্বণে ছুটির দিনগুলিতে মন্দির দু'টোতে জনস্রোত যেন আছড়ে পড়ে। কেবল বাঙালিরা নয়, বাঙালিদের পিঠোপিঠি ছত্তিশগড়ের ভূমিপুত্ররা, গুজরাটি, কেরালিয়ান, বিহারি, ওড়িয়া, মারাঠি, পাঞ্জাবি--- সে এক আকর্ষক সর্বভারতীয় জমায়েত।

ভিলাই স্টিল ক্লাবের সুইমিং ক্লাব।

সামনেই তখন লোকসভার নির্বাচন। ভিলাই স্টিলের এজিএম ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্তর প্রশস্ত ফ্ল্যাটে কখনও এসি, কখনও কুলারের হাওয়া হজম করি। ইন্দ্রজিতের বেটারহাফ সৌমা বিদুষী, মাঝে মাঝে এসে পশ্চিমবঙ্গের হালহকিকৎ সম্পর্কে এমন দু-একটা মন্তব্য করে যায়, যা যুগপৎ অকাট্য ও কৌতুকপ্রদ। সন্ধ্যায় এলেন ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বরেন্দ্রনাথ ভৌমিক। ষাটের কাছাকাছি বয়স। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রং ফর্সা, লম্বা মুখ, সোজা শক্ত নাক। সামান্য-বাক্যালাপেই বোঝা যায় মানুষটির পাণ্ডিত্য, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে, কত

গভীর। তাঁর একখানা উচ্চপ্রশংসিত বইও রয়েছে— 'The Great Awakening–An account of the Renaissance of Bengal.' প্রকাশিত হয়েছে কলকাতারই সুখ্যাত 'প্রিটোনিয়া' প্রকাশন-সংস্থা থেকে।

ভৌমিক সাহেবই আমাকে তাঁর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন ভিলাইয়ের প্রধান কালীমন্দিরের সামনে। মন্দির নির্মাণে লক্ষণীয় অনুপম গথিকরীতি। করুণাময়ী মাকে দর্শন করতে গেলে ধৈর্যের দরকার। কারণ দর্শণার্থীর সংখ্যা চমকে দেবার মতন। বাঙালি অবাঙালির ভেদাভেদ নির্ণয় সেখানে ইলিশ মাছের কাঁটা বাছার চেয়েও কঠিন। নিজেদের গরজেই সকলে সুশৃঙ্খল। সার বেঁধে মাতৃদর্শন সারছেন। অন্যদিকে দর্শনান্তে অনেকে গিয়ে ঢুকছেন মন্দিরের হলঘরে। সেখানে তাঁদের মুক্তপ্রাণ আলোচনা। শেষ নেই আলোচ্য বিষয়ের। রাজনীতি থেকে শুরু করে বিজ্ঞান অবধি। সকলেই হাসিমুখ। অথচ নিরুত্তাপ বলা যাবে না। উচ্চারিত শব্দে, বাক্যে সৌজন্য ও শালীনতা। পরোক্ষে হলেও প্রত্যক্ষে একজন আর একজনকে ঘায়েল করতে চান না।

আমি প্রায় হাঁ করে দেখছি পারিপার্শ্বিকতাকে। মনে হচ্ছে লোকগুলি যেন পরস্পর গাঁটছড়া বাঁধা। আমার পকেটে মোবাইল দু'দিন ধরে সুইচ অফ্। আরও দু'দিন ওটা বোবা হয়ে থাক। আমি শিল্পনগরীর মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে চাই। একজনের পর একজনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। আমি একজন কলমচি শুনে মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত স্থানীয় হালুইকরের মিষ্টির দোকান থেকে আনিয়ে মতিচুর লাড্ডু খাওয়ালেন। কথা বলে বুঝতে পারলাম, এখানে তৃণমূল সমেত কয়েকটি আঞ্চলিক দলকে বাদ দিলে অন্য সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থকরাই রয়েছেন মিলেমিশে। এমনকী মাথায় গান্ধী টুপি চাপিয়ে কপালে স্থায়ী ভ্রূকুটি নিয়ে একজন 'আপ' সমর্থকও। মাঝে মাঝে এক-একজন হাঁক দিয়ে উঠলে প্রত্যুত্তরও আসে চমৎকার। এ হাসিঠাট্টার পাট সহজে চুকবার নয়। আমার মতন অপরিচিত আগন্তুক আরও দু'-একজন নিশ্চয় আসছেন। কিন্তু কোনো চোখ চাওয়া-চাওয়ির ব্যাপার নেই। ভৌমিক সাহেব আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'চলুন, আপনাকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

—কোথায়?

—ভিলাইয়ের স্টিল ক্লাব। বেশি দূর নয়।

—চলুন।

সূর্য ডুবু ডুবু। পশ্চিমে আকাশ ফাগরক্তিম। মাথার ওপর উড়ে যায় পাখির ঝাঁক। গাড়ি চলছে। বাতাস শিস দেয়। পাঁচিল ঘেরা সবুজ ময়দানের অনেকটা চৌহদ্দি জুড়ে 'স্টিল ক্লাব'। লম্বা-চওড়া ইস্পাতের চাদর দিয়ে মোড়া। ভিতরে ঢুকে মনে হল, সামনে বুঝি আরব্য রজনীর একটি পৃষ্ঠা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। প্রবহমান স্নিগ্ধ নীল আলো। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা ফেলনা নয়। দু'টো দল তক্কে মগ্ন। হয়তো হাতসাফাই কিংবা তুকতাকের আশঙ্কায় খুব সতর্ক। দেয়ালে ঝুলছে অতিকায় ফ্ল্যাট টিভি। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন বেশিরভাগ সদস্যরা। আমার দৃষ্টিও ওই দিকে। বাঁ দিকের চেয়ারে ভৌমিক সাহেব, ডানদিকে আসন নিয়েছেন দশাসই চেহারার এক ব্যক্তি— যাঁর মাথায় সোলার টুপি। টিভির পর্দায় প্রথমে দেখছিলাম জপতপ ধর্মালোচনা ইত্যাদি। তখন বড় চেহারার লোকটি মাঝে মাঝে জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। হঠাৎ কে একজন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চ্যানেল বদলে দিলেন। আমি নড়েচড়ে উঠি। আরে, এ যে বাংলা চ্যানেল! এ বি পি আনন্দ। সাদা চাপদাড়ি সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় স্বরের ওঠা নামায় চমৎকার বক্তব্য রাখছেন। বক্তৃতায় রয়েছে যুগপৎ বিনয় ও বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষ।...দেখুন, আমার জ্ঞানের পরিধি কত কম! একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও জানতাম না, এ দেশেরই অন্য এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এত বড় শিল্পী যে তাঁর একটি ছবিকে বাজারজাত করা হলো এক কোটি চুরাশি লক্ষ টাকায়!! এর চেয়েও বড় কথা, আমাদের জানা উচিত কে সেই সুধী চিত্রসমঝদার— যিনি এক লপ্তে অতগুলি টাকা ঢেলে দিলেন ছবিটিকে কব্জা করতে। বাহ! আমরা ধন্য! আমরা ভাগ্যবান!

এর পরই টিভির পর্দায় দৃশ্যপটের পরিবর্তন। এখন ভাষণ দিচ্ছেন আটপৌরে পোশাক পরিহিতা এক বঙ্গললনা। কেবল ভাষণ নয়, মঞ্চজুড়ে বৃন্দাবনী-নৃত্য। ঘন ঘন আন্দোলিত হাত উত্তেজনা সঞ্চার করতে চায় শ্রোতাদের মধ্যে।...হরিদাস, হরিদাস, হরিদাস... কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবো জেলখানায়... হরিদাস! খুব অস্বস্তি হচ্ছে আমার। আমি যে ওই রাজ্য থেকেই এসেছি! এহেন অসৌজন্যে মাখো-মাখো বাক্যেন মারিতং জগৎ!... মাথা কাটা যায়!

—হোয়াট ইজ হরিদাস, স্যার?

প্রশ্নটা এল পার্শ্বে উপবিষ্ট বিপুলদেহীর কাছ থেকে।

—হরিদাস মিনস ডেভোটি অফ লর্ড কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী। ব্যাস।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আর অপেক্ষা নয়।

আমি ভৌমিক-সাহেবের হাত ধরে টানছি।

বড়দিনে ব্যোমকেশ ফিরে এলো

বিকাশ ভট্টাচার্য

বাঙালি পাঠকদের কাছে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের আবেদন দুর্নিবার। ইদানিং চলচ্চিত্র ও সিরিয়ালেও ব্যোমকেশ বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ব্যোমকেশ সিরিজের কাহিনি নিয়ে যতদূর মনে হয় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন অভিনেত্রী মঞ্জু দে। তাঁর নির্দেশনায় 'শজারুর কাঁটা' বেশ জনপ্রিয় হয়। সত্যজিৎ রায়ও ব্যোমকেশের আকর্ষণে উত্তমকুমারকে নিয়ে নির্মাণ করেন 'চিড়িয়াখানা'। এরপর আরও একজন পরিচালক করেছিলেন 'মগ্নমৈনাক'। ইদানিং পর পর তিনটি কাহিনি নিয়ে অঞ্জন দত্ত 'ব্যোমকেশ', 'আবার ব্যোমকেশ' এবং এখন 'বোমকেশ ফিরে এলো' আমাদের উপহার দিলেন। অঞ্জন দত্তের এবারের ছবিটি গড়ে উঠেছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেণীসংহার' কাহিনি অবলম্বনে।

সফল ব্যবসায়ী বিপত্নীক বেণীমাধব প্রচুর সম্পদের মালিক। বাড়ি ভর্তি ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি, নাতনি, ভাগনে এমনকী জামাই তার বৌ অর্থাৎ বেণীমাধবের মেয়েকে নিয়েও উঠেছে শ্বশুরের আশ্রয়ে। এরা কেউই তেমন রোজগার করে না। বেণীমাধব একটা উইলে সকলকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যু হলে সবাই লাভবান হবে। কিন্তু তাঁর কাছের মানুষদের আচার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তিনি উইল পাল্টে তাঁকে দেখাশোনা করে মেঘরাজ— তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে বাকিটা সমাজ কল্যাণে দিতে চান। নতুন উইলে সই হবে। তার আগে বেণীমাধবের আশঙ্কা তাঁকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে। তিনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীকে ডেকে পাঠিয়ে সব বলেন। এইরকম অবস্থায় ছবিটি শুরু হয়। শুরুতেই দেখা যায় বেণীমাধবের বডিগার্ড মেঘরাজ ও বেণীমাধবকে কে যেন গলায় ছুরি বা ক্ষুর চালিয়ে খুন করেছে।

সত্যান্বেষণের কাজ শুরু করে ব্যোমকেশ বুঝতে পারে বাড়িরই কেউ খুন করেছে। কারণ নতুন উইল সই করার আগে বেণীমাধবকে না সরালে কেউই কিছু পাবে না। বড়ছেলে অজয় গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে মেতে থাকে। স্ত্রী আরতি এতে খুশি নয়। নাতি রাজনীতি করে। নাতনি লাবণী পরাগ বলে একটি ছেলেকে ভালোবাসে। এসবে বেণীমাধব এদের ওপর সন্তুষ্ট নয়। জামাই গঙ্গাধর ধনী পরিবারের ছেলে হলেও মদ ও রেসের মাঠে সব খুইয়ে শ্বশুরের আশ্রয়ে। বেণীমাধবের একমাত্র মেয়ে এ জীবন নিয়ে খুশি নয়। ভাগনে সনৎ পেশাদার ফোটোগ্রাফার। কাগজের অফিসে কাজ করে। এদের প্রত্যেকেরই লাভ হবে বেণীমাধব মারা গেলে। কারণ প্রথম উইল অনুযায়ী তাহলে সকলেই সম্পত্তির ভাগ পাবে। আর বেঁচে থাকলে নতুন উইলে সই করবে আর সংসারের সবাই বঞ্চিত হবে। এর সঙ্গে আরও একজন আছে সে মেঘরাজের বৌ মেদিনী। যাকে গঙ্গাধর দেশ থেকে আনিয়েছে রান্না করে তাকে খাওয়ানোর জন্য। কারণ সংসারের ছেলের বৌ বা মেয়ে কাউকে তিনি বিশ্বাস করে খেতে পারেন না— যদি খাবারে বিষ মেশায়!

'বেণীসংহার' কাহিনিতে টান টান উত্তেজনা আছে। প্রত্যেকেরই হাবভাব আচরণে আছে সন্দেহের কারণ। পরিচালক অঞ্জন দত্ত সারা ছবিতে সেই উত্তেজনাটা রাখতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে ব্যোমকেশের পারিবারিক ঘটনাপ্রবাহ। সেখানে স্ত্রী সত্যবতী, সহায়ক অজিত এঁরা আছেন। আছে পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি। এসব এত বিস্তারিতভাবে না দিলেও চলত। এতে মূল রহস্য-রোমাঞ্চে ব্যাঘাত ঘটেছে। অবশ্য সত্যবতী ও অজিতের ভূমিকায় উষসী চক্রবর্তী ও শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। ছেলে অজয়ের ভূমিকায় চন্দন সেন, বৌমা আরতির চরিত্রে লকেট চট্টোপাধ্যায়, জামাই গঙ্গাধরের ভূমিকায় কৌশিক সেন এবং ভাগনে সনতের ভূমিকায় রাহুল ভালো অভিনয় করেছেন। নাতনি

ব্যোমকেশ চরিত্রে আবীর চট্টোপাধ্যায়।

লাবণীর ভূমিকায় সম্পূর্ণা অনবদ্য। বিশেষ করে ব্যোমকেশের বাড়িতে তার ছোট্ট একটা অভিনয় ভালো লাগে। মেদিনী ও নাতির ভূমিকায় যে দু'জন অভিনয় করেছেন তাদের নাম জানি না কিন্তু দু'জনেই অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

এই নিয়ে অঞ্জন দত্তের পর পর তিনটি ছবিতে ব্যোমকেশের ভূমিকায় আবীর চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করলেন। তাঁকে খুব মানিয়েছে। শুনেছি ব্যোমকেশের আরও ছ-সাতটি কাহিনি অঞ্জন নিয়ে রেখেছেন। সুতরাং ব্যোমকেশ আবীরকে আমরা আরও কয়েকবছর দেখতে পাবো। সঙ্গীতয়োজনে নীল দত্ত এবং সম্পাদনায় অর্ঘ্যকমল যথাযথ। ক্যামেরার কাজ উল্লেখযোগ্য। দু-এক জায়গায় ডিটেলের কাজে ফাঁক রয়েছে--- যা অঞ্জন দত্তের মতো পরিচালকের ছবিতে আশা করা যায় না। শরদিন্দুর অন্যান্য ব্যোমকেশ কাহিনির মতো এ ছবিতেও রাজনীতির আবহ আছে। পরিচালক খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে তা ব্যবহার করেছেন। ছবিটির প্রযোজক কৌস্তভ রায়।

শব্দরূপ-৭৩৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

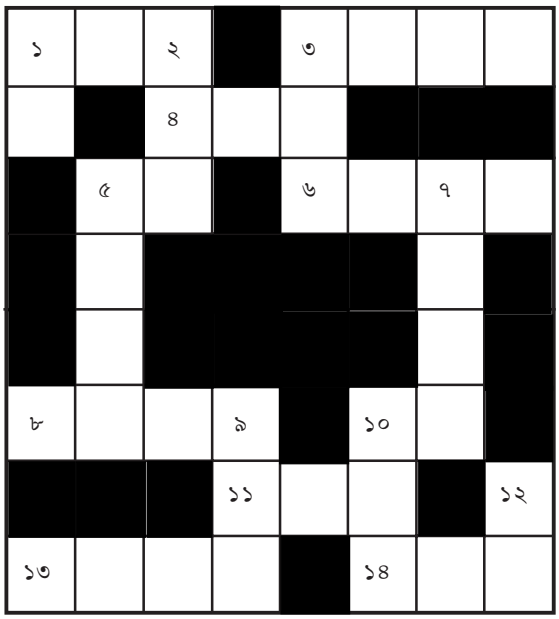

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পুরাণোক্ত মণিবিশেষ, কৃষ্ণের ভূষণ, **৩.** ''জাগরণে যায়—''; রাত্রি, **৪.** যে ঘরে বরকন্যা বিবাহ রজনী যাপন করে, **৫.** বালক কৃষ্ণের পছন্দের খাবার; মাখন, **৬.** বৃদ্ধের যা গিয়ে এককালে ঠেকে, **৮.** উত্তর রামচরিত রচয়িতা বিখ্যাত সংস্কৃত কবি, **১০.** অপ্সরাতুল্য সুন্দরী উপদেবতা বিশেষ; যার ডানা আছে, **১১.** অদৃষ্ট, ভাগ্য, **১৩.** বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, **১৪.** কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উল্লিখিত ধনপতি সদাগরের প্রথমা পত্নী।

উপর-নীচ : ১. তান্ত্রিক বামাচার, **২.** ''ভাঁড়ে মা—'' (বাগধারায়); দুর্গা, **৩.** নিবৃত্তি; 'এর পর ফিরে আসছি', **৫.** দিনরাত, **৭.** বাণভট্ট প্রণীত কথাগ্রন্থ বিশেষ, **৯.** ললাট, বাহু ইত্যাদিতে অঙ্কিত চিহ্ন, ফোঁটা, **১০.** এটা তোলা মানে মৃত্যু (বাগধারায়), **১২.** কিংবদন্তীপ্রসিদ্ধা জ্যোতির্বিদ নারী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৩৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ১০

শীত অধিবেশনে লোকসভায় ৯৮ শতাংশ কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০০৪-এর পর ২০১৪, প্রায় একদশক পরে শীতকালীন অধিবেশনের একই চিত্র ফুটে উঠল সংসদে। ২০০৪ সালে তৎকালীন এনডিএ জোট সরকার লোকসভা এবং রাজ্যসভার শীতকালীন অধিবেশনে ১০১ শতাংশ কাজ করে দেখিয়েছিল। ঠিক তেমনই ২০১৪ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ৯৮ শতাংশ কাজ করে দেখিয়েছেন মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। কিন্তু গত দশ বছরের মধ্যে ক্ষমতায় থাকা ইউপিএ জোট সরকার তা একবারও করে দেখাতে পারেনি। অবশ্য ২০০৫-এ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে ইউপিএ সরকার ৮৬ শতাংশ কাজ করতে পেরেছিল।

এবার লোকসভাতে সফল হলেও রাজ্যসভাতে বিজেপি সংখ্যালঘু থাকায় ৫৯ শতাংশ কাজ হয়েছে। গত দশ বছরের লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে ২০০৪ সালের পর দ্বিতীয় কোনো সফল অধিবেশন হলে তা হবে ২০১৪-এর অধিবেশন। যেখানে মাত্র নির্ধারিত সময়ের ২ শতাংশ অপচয় হয়েছে। বর্তমানে সংসদের লোকসভা কক্ষে বিজেপি-র একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন থাকায় সময়কে কাজে লাগিয়ে যতটা কাজ করা সহজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই তুলনায় সংসদের অপর কক্ষ রাজ্যসভাতে তা ততটাই কঠিন হয়ে উঠেছে। রাজ্যসভার অধিবেশনের শেষ দুই সপ্তাহ অচলাবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। তাই এবার ঠিক হয়েছে রাজ্যসভার অধিবেশন বসার সময় প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে বাড়ানো হবে। লোকসভাতে যেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৪৪ শতাংশ অর্থকরী সময় ব্যয় হয়েছে, সেখানে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ৩৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে এবং প্রশ্নপর্বের জন্য হ্যয় হয়েছে ১৪ শতাংশ সময়। রাজ্যসভাতে সেখানে ৩৪ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, ৩৩ শতাংশ গেছে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে এবং ৮ শতাংশ গেছে প্রশ্নোত্তর পর্বে। বিরোধী দলগুলির হৈ-চৈ করার কারণেই রাজ্যসভায় সময়ের অপচয় হয়েছে।

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭, মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12

71, Park Street, Kolkata - 700 016

98311 85740, 98312 72657

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
5 January - 2015

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা